ত্রিবেণী

(উপন্যাস)

সুশীল রায়

এস. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড
১সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীসাগরময় ঘোষ

বন্ধুবরেষু

চুম্বক

প্রথম অধ্যায় - দুই বোন

দ্বিতীয় অধ্যায় - সাহিত্যিক শকুন্তলা

[অবতরণিকা এপার ওপার, অচেনা বন্দর]

তৃতীয় অধ্যায় - দার্জিলিঙের লতা

চতুর্থ অধ্যায় - ছায়ানটী

সুশীল রায়ের অন্যান্য বই

উপন্যাস

একদা

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

কবিতা

সুচরিতাসু

ছোটদের উপন্যাস

আকাশ স্বপ্ন

ত্রিবেণী

ত্রিবেণী

প্রথম অধ্যায়

দুই বোন

করতোয়া রাস্তায় নেমে এলো। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, কালো পীচের রাস্তা জলে ভিজে চকচক করছে। করতোয়ার চোখে রাস্তাটি বিরাট বিষধর সাপের মতো মনে হ'লো। মনে হ'লো, সে যেন ক্রমশ সেই মহাসাপের অবয়ব অতিক্রম ক'রে তার বিকট গ্রাসের অভিমুখে ছুটেছে। কখন কার কি ঘটে কেউই বলতে পারে না, এ কথা সত্য। কিন্তু এও তথৈব সত্য-যে করতোয়া প্রথম থেকে সতর্ক হ'লে তার এমন দুর্গতি আজ ঘটতো না। কিন্তু সে কেমন ক'রে বুঝবে বলো! দুর্জয়-যে তাকে সহসা এমন প্রবঞ্চনা করবে, এ-যে ছিলো তার কল্পনার অতীতে।

করতোয়া একটু দাঁড়ালো। রাত এখন অনেক বেজে গেছে। কোন্ পথ দিয়ে গেলে সোজা সে নদীর দিকে যেতে পারে; এই চিন্তাই হ'লো প্রবল। ইলেকট্রিকের আলোগুলো অনেকটা দূরে দূরে বসানো, রাস্তার অন্ধকার গিয়েছে কিন্তু আলো হয় নি।

কাবেরী এখন কী করছে? সেও কি তারি মতো রাস্তায় নেমে এসেছে? তারা দুই বোন মিলেজুলে আজ এ কী করতে চ'লেছে? করতোয়া চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। সেই তো প্রথম এ যুক্তি আবিষ্কার ক'রেছে; এবং আবিষ্কার ক'রেই সে ক্ষান্ত হয় নি, কাবেরীকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজিও করেছে।

করতোয়া ভালো ক'রে গায়ে কাপড় জড়িয়ে নিলো। রাস্তার চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলো, কেউ আসছে কিনা! তার একটু একটু শীত করছে যেন। অসময়ের বৃষ্টিতে তার গা শির শির ক'রে উঠ্‌ছে। করতোয়া আর দ্বিধা না ক'রে, বুকে প্রচুর বল সঞ্চয় ক'রে এবার দ্রুত হাঁটতে সুরু করলো। নাঃ, বৃথা আর সময় নষ্ট ক'বে দরকার নেই, পঞ্চবটীর ওধারে গিয়ে সে কাবেরীর জন্যে অপেক্ষা করবে কথা আছে।

করতোয়ার নিজেরই কেমন যেন আশ্চর্য লাগছে, কী ভীষণ দুঃসাহস তার, অতগুলো লোকের সম্মুখ দিয়ে নির্বিঘ্নে কেমন সে বেরিয়ে এলো। নাঃ, কাবেরীকে নিয়ে কোন কাজ করার যো নেই। করতোয়া তাকে আগে পার ক'রে দিয়ে আসবে ব'ললো, তাতে সে মোটেই রাজি হ'লো না।

পেছনে তাকাতে তাকাতে গুটিগুটি পায়ে করতোয়া এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্টএ উঠ্‌তে আরম্ভ করলো। উঠ্‌তেই পদ্মার এক ঝলক বাতাস তার মুখে এসে ঠাণ্ডা আঘাত দিয়ে গেলো। একটা ভীরু নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে শঙ্কিত পায়ে সে পাঁচআনীর মাঠে নেমে এলো। সহরের সমস্ত বাতাসের যেন এ জায়গাটা মিলনস্থল, এখান থেকেই যেন তারা দিকে দিকে প্রেরিত হয়। এত বাতাস, এত আনন্দ তবু মানুষকে

স্বেচ্ছায় মরতে হয়। এ যেন করতোয়ার কাছে বড়ই আশ্চর্য ঠেকে। কেন, সে তো নির্বিঘ্নে না ম'রে বেঁচে থাকতে পারে। এক দুর্জয়ই কি তার জীবনের প্রধান এবং একমাত্র সম্বল ?—যে, কেবল তারি জন্যে তাকে মরতে হ'চ্ছে। করতোয়ার একবার ইচ্ছে হ'লো, আবার সে ফিরে যায়। কিন্তু ফিরে গেলে তার চলবে কেমন ক'রে ? এদিকে কাবেরী যদি এসে একা একাই। করতোয়া এগিয়ে চ'ললো।

এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্টের ওপারে একটা মোটর হর্ন দিল। করতোয়া বুঝলো, এ নিশ্চয়ই তাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে। এবার সে পেছনে তাকিয়ে ছুটতে আরম্ভ করলো, সে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হ'য়েছে, উর্ধ্বশ্বাসে করতোয়া ছুটছে।

একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে করতোয়া কাঁপতে লাগলো। আজ যদি তাকে এমন ভাবে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, তবে কেলেঙ্কারীর আর সীমা থাকবে না। সে কেমন ক'রে তা সহ্য করবে ? না, মোটরটি দাঁড়ালো না। করতোয়া আশ্বস্ত হ'লো।

নদীর দিকে অনেকটা নেমে গিয়ে করতোয়া পঞ্চবটীর দিকে হাটতে আরম্ভ করলো। নদীর জলও গিয়েছে শুকিয়ে, তবু ডুবে মরার পক্ষে জল আছে প্রচুর, এটুকু করতোয়া বুঝতে পারছে।

শ্মশান আজ একেবারে ফাঁকা। করতোয়া পঞ্চবটীর কাছে ব'সে শ্মশানের দিকে তাকালো। একটা ঠাণ্ডা ভয়ে তার শরীর রোমাঞ্চিত হ'লো, কানের কাছের চুলগুলো শিরশির ক'রে উঠলো। তার মনে হ'লো, পৃথিবীর সমস্ত প্রেত যেন এই পঞ্চবটীর নিবিড় বনের প্রত্যেকটি গাছে বাসা বেঁধেছে, যেন তারা তাদের অশরীরী দেহ নিয়ে ন'ড়ে-চ'ড়ে

উঠছে। ওই যে কালো কি যেন! হয়ত হাত-পা ঝুলিয়ে ব'সেছে কোনো ছায়াময় মূর্তি।

দাঁতে দাঁত লাগিয়ে করতোয়া ভয়কে জয় করবার চেষ্টা করলো। সে ভুলে গিয়েছিলো, সে আজ এখানে এসেছে আত্মহত্যা করতে। তার তবে এত ভয় কেন? করতোয়া দৃঢ় হ'লো। সে নিজেকে নিশ্চিহ্ন ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করলো। চেষ্টা করলো, দুর্জয়কে মনে করার। সত্যি, এমন মিথ্যা কথা মানুষ ব'লতে পারে?

প্রথম দিন থেকে সমস্ত কথা করতোয়া একে একে মনে করার চেষ্টা করলো। সে-যে তাতে আনন্দ পাবে ব'লে সে-সব কথা মনে করছে, তা নয়। এতে সে নিজেকে ভুলে যাচ্ছে, ভুলে যাচ্ছে সে কোথায় ব'সে আছে।—

হিলি ষ্টেশনে আসাম-মেল্ সেদিন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো। করতোয়া আর কাবেরী তাদের কাকার সঙ্গে যাচ্ছিলো কার্সিয়াঙ। কাকার সঙ্গে আলাপ হ'লো দুর্জয়ের, সে-ও নাকি চ'লেছে দার্জিলিং, কিন্তু আপাততো শিলিগুড়ি,—সেখানকার কাজ সেরেই দু'তিন দিনের মধ্যে সে দার্জিলিঙএ উঠবে—মনে মনে তো এমনি এঁটেছে, শেষ-বেশ কি হয় কে জানে!

গোড়ার কথা এই টুকুই। তারপর দুর্জয় তাদের কার্সিয়াঙের বর্ধমান রোডের বাসাতে এসে সেই-যে আস্তানা গাড়লো, আর নড়তে চায় না।

করতোয়ার সঙ্গে তার প্রথম কথা করতোয়া এখনো ভোলেনি, দুর্জয় একদৃষ্টে বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে ব'ললো, দি ক্লাউড? (করতোয়ার দিকে তাকিয়ে) চমৎকার কিন্তু আপনাদের এ বাসার নাম!

করতোয়া ব'ললো, হুঁ।

কাবেরী বেতের চেয়ারে ব'সে একদৃষ্টে দূরের শাদা এক-চাপ মেঘের দিকে তাকিয়ে মনে মনে হয়ত ভাবছিলো, কেমন ক'রে, কোথা থেকে, কেনই-বা এখানে এ-মেঘের আবির্ভাব হয়।

দুর্জয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ললো, কি ভাবছেন ?

কাবেরী কুঁকড়ে ব'সে, অকারণে হাঁটুর কাছে একটু কাপড় টেনে ব'ললো, কিছু না তো !

দুর্জয় হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। ব'ললো, আমারো অমন একদিন ছিলো, আমিও ওই রকম অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়তাম। বিশ্বাস করুন ! এই যে কাকা, আসুন। গিয়েছিলেন কোথায় ?

দুর্জয় একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে ব'ললো,আমিও ঘুরে এলাম। একটু খাদের দিকে গিয়েছিলাম। আরো যেতাম, একজন ব'ললে— ওদিকে নাকি ভালুকের ভয়, তাই ফিরে এলাম। আপনি গিয়েছিলেন কোন দিকে ?

—আমি ? আর যাব কোথায় বলো, পাঙ্খাবাড়ির রাস্তা ধ'রে খানিকটা ঘুরে এলাম। আমার এক বন্ধু ওখানে থাকে ! ওরে কাবী, তোরা একবার কাল সকালে বেড়াতে বেড়াতে ওদের ওখানে যাস্, শকুন্তলা তোদের ডাকছিলো। (করতোয়াকে) বেলা, কই, চা খাওয়াবে না ?

করতোয়া ব'লেছিলো, কেন, শকুন্তলা খাওয়ালো না ? বললাম, খেয়ে দেয়ে বেরোও !

কাকা হেসে উঠলেন, দুর্জয়কে ইসারা ক'রে ব'ললেন, চ'টেছে।

দুর্জয় হাত কচলে বড আন্তরিক এবং ঘনিষ্ঠ হওযার চেষ্টা করলো, ব'ললো, ভয়ানক।

কাবেরী ব'ললো, শকুন্তলাদি একবার এলেও তো পারেন। আমরা এসেছি, আমাদের সঙ্গে তাঁর আগে দেখা করে যাওয়া উচিত।

কাকা চোখ বড ক'রে ব'ললেন, জানিস্ নে? ও, ব'লতে ভুলে গেছি, প'ড়ে গিয়ে ও-যে প্রায় খোঁড়া হ'য়ে গেছে। পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে—

করতোয়া ব'লেছিলো, সে কি? তা তো বলনি!

কাকা ব'ললেন, সাধে কি আর চা দিতে পারেনি, তার ওপর কলিক্‌পেন্, বুক ধড়ফড়, নানারকম রোগ! নিখিলের তো চোখ ছানাবড়া, একটি মাত্র মেয়ে নিয়ে সে যাই-যাই!

দুর্জয় কাকার মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ললো, তাই নাকি? তারপর জিভ দিয়ে তালুতে অদ্ভুত এক শব্দ করে ব'ললো, তা হ'লে বেজায় মুস্কিল বলতে হবে!

করতোয়া সামে চায়ের ট্রে বসিয়ে নিজেও ব'সে পড়লো।

দুর্জয়ের কথাবার্তা, গায়েপড়া ভাব কাবেরী বরদাস্ত করতে পারতোনা। কিন্তু খুলে ব'লতে কি, প্রথম দিন থেকে করতোয়া তাকে যেন স্নেহ করে ফেলেছে। কিন্তু এ-কথা সে কাবেরীর কাছে প্রকাশ করতে ভয় পেতো।

পরদিন সকালে দুর্জয় দার্জিলিঙ যাবে ঠিক করলো। কথাটা করতোয়ার বুকে দুঃসংবাদের মতো আঘাত দিয়েছিলো, আজ এই নদীতীরে অন্ধকারের মধ্যে ব'সে, সে-কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে তার।

আজ আত্মহত্যা করার সঙ্কল্প নিয়েও সে ভুলতে পারছে না, সে দুর্জয়ের কাছে কতটা আত্মঋণী।

দুর্জয় পরদিন সত্যি সত্যিই দার্জিলিঙ গেলো। যাওয়ার সময় তাদের সকলকে বার বার নিমন্ত্রণ ক'রে গেলো, তারা যেন তাদের ওখানে যায়। সে যেমন কয়েকদিন এখানে কাটিয়ে গেলো, তারাও যেন তেমনি তার ওখানে কয়েক দিন কাটিয়ে আসে। এতে দুর্জয়ের নাকি আনন্দের সীমা থাকবে না, আর এতে সে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবে নাকি। দার্জিলিঙে তার বাবা-মা, ছোটো-বোন খেয়া, বড-বোন লতা সবাই আছে। নাঃ, তার বড়-বোন এখনও অনূঢ়া, বিয়ে হবে না, সেজন্য চেষ্টাও কিছু হয়নি, কারণ সে প্যারালিটিক্, তার ওপর বাঁ চোখ অন্ধ। আর বলেন কেন, ভগবান যার ওপর বিরূপ তাকে নানা উপায়ে শাস্তি দেন। ইত্যাদি নানা প্রকার কথা ব'লতে ব'লতে দুর্জয় বেরিয়ে গেলো।

দুর্জয় সেই যে ডুব দিলো, প্রায় দিন দশ তার আর পাত্তা পাওয়া গেলো না। কাকা ব'ললেন, ও এক পাগল।

কিন্তু করতোয়া ব'সে ব'সে কি যেন ভাবতো। ভাবতো, সে দার্জিলিঙ গেছে, সে দুর্জয়ের অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠছে, ম্যালরোড্ ধ'রে কত বেড়াচ্ছে তারা। হীলকার্ট রোড্ ধ'রে কতদূর এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুর্জয় কোথায়?

আজকেও এই নদীর ধারে ব'সে তার মনোভাব অনেকটা সেই রকমের। দুর্জয়, তুমি কোথায়?

হঠাৎ একদিন দুর্জয় এসে হাজির হ'লো। (করতোয়া ভাবছে, আজকেও তেমনি এলোনা কেন?) করতোয়া গম্ভীর হ'য়ে ব'সে

সুদূরের শাদা পাহাড় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছিলো, তার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড বেজে উঠছিলো গির্জার ঘণ্টার মতো। তার মনে হচ্ছিলো, তার রক্তাধার যেন তার মুখের মধ্যে উঠে এসেছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুর্জয় কাকার সঙ্গে কথা ব'লছে। পাশের ঘরে ব'সে কাবেরী চুপি চুপি কবিতা লিখছে। লিখছে আর কাটছে, মন উঠছেনা, কেটেকুটে দাঁড়িয়েছে এমনি—

হে ক্রেপ্‌টোমারিয়া, তুমি পাহাড়ের গাছ!—
পাহাড়ের গাছ তুমি, পাইনের বোন।
ঝিরঝির কথা কও ঝরনার সাথ,
ঝরনার সাথ মোর মন উচাটন।
কাকের চোখের মতো জলে ঝরনার
দুলছে তোমার ছায়া করে কিলবিল।
এবং—

. পেছন থেকে দুর্জয় ব'ললো—অপূর্ব! তারপর? এবং, লিখুন, এবং—

কাবেরীর গাল লাল হ'য়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি কাপড়ের মধ্যে খাতাটি লুকিয়ে চাপা গলায় ব'ললো, অসভ্য।

মাঝের দরজা দিয়ে করতোয়া তাকিয়ে দেখছিলো, আর সে না ব'লে পারলো না, ব'ললো, কখন এলেন? দুর্জয় দরজার দিকে তাকিয়ে করতোয়াকে দেখেই ব'ললো, এই যে। এলাম এক্ষুনি, তারপর?

—তারপর ভালো আছেন সবাই?

দুর্জয় একবার কাবেরীর দিকে তাকিয়ে একটু দ্বিধা ক'রে করতোয়ার দিকে এগিয়ে এলো, ব'ললো, হ্যাঁ, তা এই এক রকম

কেটে যাচ্ছে। খুব চ'টেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু বিশ্বাস করুন, একটা চিঠি যে লিখবো—চলুন ও-ঘরে বসি গিয়ে।

কাবেরী রূঢ় কটাক্ষে দুর্জয়ের দিকে তাকালো। তারা দু'জন কিন্তু কোনো দিকে না তাকিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলো। দুর্জয় একটা চেয়ারে ব'সতে ব'সতে ব'ললো, একটা চিঠি যে লিখবো এমন সময় পর্যন্ত পেলাম না। লতার অসুখটা আবার একটু বেড়েছে (একটু হেসে) না, দিদি বলি না। ছোটো বেলা থেকে নাম ধ'রে ডেকে ডেকে একটা অভ্যাস হ'য়ে গেছে, এখন ছাড়া মুস্কিল! কিন্তু উৎপলবাবু খুব করছেন লতার জন্যে, ব'লতে হবে। হ্যাঁ, উনি ডাক্তার।

—তিনি একেবারেই পঙ্গু হ'য়ে গেছেন নাকি? করতোয়া সহৃদয় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলো।

দুর্জয় সজোরে মাথা নেড়ে ব'ললো, নাঃ। চ'লতে ফিরতে পারে, মুখের ভাবও ঠিক আছে, বেঁকে বিশ্রী হ'য়ে যায় নি। তবে, বাঁ-অঙ্গ একটু ঢিলে গেছের, সঙ্গে সঙ্গে বাঁ চোখটা। এই যে কাকা, আসুন! দুর্জয় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো: এই, বাসার সব সংবাদ দিচ্ছি আর কি।

কাকা আন্তরিক গলায় ব'ললেন, দাও! কাবী কোথায়? ও-ঘরে বুঝি?—কি ব'ললে? কবিতা লিখছে? কাবী আজকাল কবি হ'চ্ছে দেখছি!—ব'লতে ব'লতে এবং হাসতে হাসতে কাকা চ'লে গেলেন।

নদীর ভিজা মাটীর ওপর ব'সে করতোয়া চোখের কোন মুছলো। হঠাৎ তার মনে হ'লো—কৈ, কাবেরী তো এখনো এলো না! সে তা হ'লে পথ ভুল ক'রেছে নাকি? এতক্ষণ তো তার আসা উচিত

ছিলো। করতোয়া এবার চারদিক তাকালো, তার রীতিমতো আশ্চর্য লাগলো তার আর ভয় করছে না দেখে। ভয় তার করছে না, কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে সে অন্ধকারকে দেখতে লাগল। অন্ধকারকে চিরজীবন সে কুৎসিত বলেই জেনে এসেছে, কিন্তু তার কেন যে আজ বেশ মনোরম লাগলো রাত্রের এই নিষ্কলুষ অন্ধকারকে। যে-মৃত্যুকে মানুষ দুর্বার ব'লে ভয় করে, যে-মৃত্যু অন্ধকারের মতো রহস্যাবৃত, তারও স্বীয় একটা সৌন্দর্য তা হ'লে আছে। আপাততো এ আবিষ্ক্রিয়া করতোয়ার কাছে প্রচুর সান্ত্বনা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মরতে যখন সে এসেছে, সে মরবেই, এখন শুধু কাবেরী এসে পড়লেই হয়। করতোয়া আবার স্থির হ'য়ে ব'সলো।

ঠিক এই রকম স্থির হ'য়ে সে বসেছিলো একদিন কার্সিয়াঙের সেণ্ট্-মেরীর গির্জার পাশের পাইন-বনে, সঙ্গে সেদিন ছিলো দুর্জয়। আজকে তার সম্মুখে যেমন পদ্মার দুর্বল স্রোত ঝিরঝির ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে, সেদিনও তেমনি হোসেন-ঝোরার দুর্বার স্রোত পাহাড়ের শিলাখণ্ডের আশপাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে ঝিরঝির ক'রে ব'য়ে গিয়েছিলো। কাবেরী সেদিন কাকার সঙ্গে গিয়েছিলো শকুন্তলাদের বাসায় বেড়াতে। আর এরা দুজন এসেছিলো এই দিকে।

দুর্জয় একটু পাগলাটে গোছের ছেলে, করতোয়ার গায়ে ধাক্কা দিয়ে ব'লেছিলো, এখান থেকে কে এক লাফ দিয়ে পড়তে পারে নীচে!

করতোয়া নীচে তাকাতেই তার বুক কেঁপে উঠ্‌লো, দেখলো, সরু রেল লাইনের উপর দিয়ে দার্জিলিঙের দিকে চ'লেছে একটা ট্রেন। যেন সত্যিকারের ট্রেন নয়, করতোয়ার তাই মনে হ'য়েছিলো,

এবং ভালোও লেগেছিলো। মনে হয়েছিলো, যেন একটা জাপানী খেলনা গাড়ী অনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চ'লেছে। যে কোন মুহূর্তে দম ফুরিয়ে গেলেই থেমে যাবে। করতোয়া নীচের দিক থেকে চোখ তুললোনা। লাল লাল শেড গুলো, রং-বেরংএর অজস্র নামহীন পাহাড়ী ফুল, পাহাড়ের ঢালু গায়ে গুচ্ছ গুচ্ছ অগুন্তি চায়ের গাছ, মাঝে মাঝে শাদা রঙের পাহাড়ী পথ, কোথাও অদৃশ্য হ'য়ে গেছে, আবার এক ঝাঁক ক্রেপটোমারিয়া গাছের পায়ের নীচ দিয়ে বেরিয়ে এঁকে বেঁকে যেতে যেতে ঢালু হ'যে নেমে তির্যক ভঙ্গিতে মুচড়ে ঘুরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, করতোয়া একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে রইলো। দুর্জয়কে ব'ললো, ওই সব রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছ করে। কী চমৎকার বলুন তো!

দুর্জয় একটু হেসে বললো, চমৎকার এ জায়গাটাও—যেখানে আমরা ব'সে আছি। কিন্তু চমৎকার লাগছে না, কারণ আমরা একে পুরোপুরি আয়ত্ত ক'রেছি। ওখানে গেলেও ওর সৌন্দর্য আমরা নষ্ট ক'রে ফেলবো আমাদের উপস্থিতি দিয়ে। আর, একটু জেনো—ডাও-হিলের লোকেদের চোখে আমাদের এ জায়গাটাও স্বপ্নের মতো মনে হ'চ্ছে।

দুর্জয়ের কথা মনের মত হ'লো না তার। করতোয়া মনে মনে ভাবলো, সে এত সুন্দর দেশে, এমন মধুর পারিপার্শ্বিকে বসবাস করেছে! এ কথা তো সে আগে জানতো না!

সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে তারা উঠেছিলো সেণ্ট মেরীর চার্চে। কিন্তু ওপথ বড় দুর্গম, তাই এবার একটু ঘুরে রাস্তা দিয়ে নামতে আরম্ভ করলো। হঠাৎ করতোয়া গেল থেমে, অনেক দূরে পাহাড়ের গা দিয়ে একটা ট্রেন ধীরে ধীরে নেমে আসচে, এ-দৃশ্যটি তার চোখে এমন

মধুর লাগলো তা বলার নয়। করতোয়া দাঁড়িয়ে গেলো ট্রেনের ধীরে ধীরে নেমে-আসা দেখবে ব'লে। কিন্তু ভগবান সব সময়ই তার ওপর এমন বিরূপ, হঠাৎ এক চাপ মেঘ এসে সৃষ্টি ক'রে দিলো অন্ধকার। তারা দুজন কিছুক্ষণ দাঁড়ালো, চারদিকে মেঘ। দূরের পাহাড় গুলো মেঘের ছায়ায় কালো হ'য়ে উঠেছে: কাবেরীর লেখা কয়েকটা লাইন তার মনে পড়লো:

> হে বিধাতা, শিল্পী করো, আমি তবে চারকোল্ দিয়ে,
> পাহাড়ের শীর্ণ স্মৃতি সূক্ষ্ম শিল্পে তুলিব বাঁচিয়ে।
> আমারে ক'রোনা কবি, ভাষাহীন তীব্র প্রেরণাতে
> আমারে দিয়ো না জ্বালা, শুধু দাও চারকোল্ হাতে!
> ধূসরিত পাহাড়ের এ সৌন্দর্য দিবে না বাঁচাতে?

সত্যি, পাহাড়ের এ ধূসর রূপ কখনোই বাস্তব মনে হয় না। মনে হয়, যেন কোনো ছবির ভিতরে দাড়িয়ে আছি। করতোয়া একটা নিশ্বাস ফেললো, তাকিয়ে দেখলো চারদিক—যেন দূরের শূন্য থেকে তার চোখের সম্মুখে কেউ ঝুলিয়ে দিয়েছে আকাশের ফ্রেমএ আঁটা একটা প্রকাণ্ড চারকোল্ ড্রয়িং।

দুর্জয় ব'ললো, চলো নামি।

দ্বিরুক্তি না ক'রে করতোয়া নেমে এলো। বাসায় ফিরে দেখে, কাবেরী আর কাকা এসে গেছেন।

কাবেরী দুর্জয়ের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো! দুর্জয় তা লক্ষ্য করেনি, সে কাবেরীর কাছে গিয়ে অমায়িক গলায় ব'ললো, বেড়িয়ে এলাম গির্জা থেকে।

কাবেরী ব'ললো, হুঁ।

একটু পরে আকাশ কালো হ'য়ে গেলো, পাহাড় হলো অদৃশ্য সুদূরে ঘুম-পাহাড়ে এক লাইন বাতি উঠলো জ্ব'লে।

করতোয়া দুর্জয়ের কাছে এসে ব'ললো, রাত্তির কিন্তু ভালো লাগে না। কী বিশ্রী অন্ধকার বলুন তো। তাব-চে দিনই ভালো, কি বলুন!

কিন্তু আজ করতোযাব রাত্রির ঘনান্ধকার ভালো লাগছে। সে নদী তীরে ব'সে ভাবছে, কেন ওদেব দু-বোনেব বিযেব ঠিক হলো একই সঙ্গে! মনে মনে সে এঁটে বেখেছে দুর্জয়কেই সে বিযে কববে। কোন অজ্ঞাত, সম্পূর্ণ অপবিচিত একজনকে তাব বন্ধু বলে মেনে নেওযা যে অসম্ভব! তার ওপর কাবেবীব যাব সঙ্গে বিযে ঠিক হযেছে তাব টাকা বাদে কিছু আছে বলে মনে হয না। এই জন্যেই-না আজ তাদেব দু'জনকে এক সঙ্গে সমাপ্ত হ'যে যেতে হ'চ্ছে। কাকাকে ব'লে কিছু হওয়ার জো নেই, মানুষ তিনি মন্দ নন্, কিন্তু যা বলবেন তা কববেনই—এই হ'লো তার প্রধান দোষ।

দু'বোনে এক সঙ্গে ব'সে জটলা ক'রেছে। তারা দু-জন স্থির ক'রেছে, যেমন ক'রেই হোক্ এব প্রতিবিধান তারা কববে।

কাবেবী বললো, কিন্তু কি করা যায়?

করতোয়া সহজ গলায় বললো, কেন, মরবো!

—আর দুর্জয়বাবু যদি সত্যি এসে পৌছন! কাবেরী করতোয়ার মুখের দিকে তাকালো। করতোযার মুখ উজ্জ্বল হ'যে উঠ্লো বটে কিন্তু সে কিছু বলতে পারলো না।

কাবেরী ব'ললো, তবে আমি?

করতোয়া একটা নিশ্বাস ফেললো, ব'ললো, সে আর এসেছে। যদি আসবার হ'তো এতক্ষণে এসে পৌছতো তা হ'লে।

কাবেরী ব'ললো, চিঠি যখন লিখেছেন, যেমন ক'রেই হোক্ তিনি আসবেন। কিন্তু আমার কথাটা একবার ভাবো।—সত্যি, এ বিয়ে না দিলেই চ'লতো না কাকার? টাকা নিয়ে আমি কি করবো, আমি তো— কে?

কাকা একবার উঁকি দিয়ে গেলেন. ও, তোরা! মুঙ্গের থেকে ওরা এলো যে, তোর ছায়াদিরা!—ব'লে কাকা চ'লে গেলেন।

—আসুক। করতোয়া ব'ললো। এবং কাবেরীকে ব'ললো, তোর তবু এক সপ্তাহ পরে, ভাববার সময় পাবি, কিন্তু আমি, আমার আর সময় কই। করতোয়া একটু অধীর গলায় বল'লো।

কাবেরী এর কোনো উত্তর দিতে পারলো না। সত্যি তার বিয়ের এখনো এক সপ্তাহ বাকী, কিন্তু করতোয়ার বিয়ে যে আগামী কাল হবেই। ছেলে নাকি দিল্লীতে স্টেনোগ্রাফার, প্রথম বউ অল্প বয়সে মারা গেছে, কিন্তু বয়স গিয়েছে এখন তেত্রিশের গায়ে, গোঁফ নাকি লম্বা লম্বা—অসহ্য। করতোয়া কখনই বরদাস্ত করতে পারবে না। দুর্জয়কে সে এ বিষয়ে চিঠিতে জানিয়েছে। উত্তরে সে লিখেছে—অধৈর্য হয়ো না। বন্দোবস্ত একটা হবেই। বিয়ের আগের দিনই আমি গিয়ে পৌছবো। সুরাহা কিছু একটা হবে, দেখে নিও। তাতে যে যাই বলুক।

কিন্তু আজই তো বিয়ের আগের দিন। দুর্জয় তো এসে পৌছলো না এখনো। রাত্রি প্রায় নটা বেজেছে। দুইবোন এ... মুখের দিকে তাকিয়ে ব'সে আছে চুপচাপ।

কাবেরী ব'ললো, মরা উচিত আমারি আগে তা হ'লে!"

করতোয়া ব'ললো, আগে পরে নয়,—একসঙ্গে। দুর্জয় আর আসবে না।

কাবেরী ব'ললো, তিনি না তোমাকে অধৈর্য হ'তে বারণ করেছেন।

করতোয়ার মনে পড়লো একটা ঝরনার কথা। একদিন সেই ঝরনার ধারে ব'সে দুর্জয় তাকে উপদেশ দিয়েছিলো, ব'লেছিলো, মানুষের কোন সময়ই বিহ্বল হওয়া উচিত নয়। জানো করতোয়া, আজই একটা বই পড়ছিলাম, তাতে বেশ একটা সুন্দর কথা দেখলাম। বিগত মহাযুদ্ধের সময় সৈনিকদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, লিখেছে—'যখন তুমি যোদ্ধা হয়েছ তখন তুমি দুয়ের যে-কোনো একটা; হয় তুমি লাইনের সম্মুখে থাকবে কিংবা পিছনে। যদি তুমি পিছনেই থেকে থাকো তোমার ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। যদি সম্মুখে থাকো তবে তুমি দুয়ের যে-কোন একটা; হয় তুমি বিপদের গণ্ডির ভিতরে, না হয় এমন গণ্ডিতে যেখানে বিপদ নেই। যদি তুমি সেই গণ্ডিতে থাকো যেখানে বিপদ নেই, তাহ'লে তোমার ব্যস্ত হবার কি আছে? আর যদি বিপদ-গণ্ডির মধ্যে থাকো তা হ'লে তুমি দুয়ের যে-কোন একটা; হয় তুমি আহত হবে কিংবা আহত হবে না। যদি আহত না হও তা হলে ব্যস্ত হবার কি আছে? আর যদি আহতই হও তা'হলে তুমি দুয়ের যে-কোনো একটা; হয় গুরুতর আহত হবে, না হয় অল্পের উপর দিয়ে যাবে। যদি অল্প আহত হও, তবে ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আর যদি গুরুতর আহত হও তা হ'লে তুমি দুয়ের যে কোনো একটা; হয় তুমি মারা যাবে কিংবা মারা যাবে না। যদি মারা না যাও তবে ব্যস্ত হবার কিছু নেই, আর যদি মারা যাও তা হ'লে ব্যস্ত হতে

পারছোনা। সেই জন্যই এমন কোনো জিনিষ নেই যার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে!'—তাহ'লেই বুঝতে পারছো সব সময় দৃঢ় হওয়া উচিত। জীবনের সমস্ত যুদ্ধেই আমাদের এই কথাগুলো মনে রাখা দরকার।

নদীর ধারে ব'সে এই কথা আবার মনে হ'তেই সে চমকে উঠলো। তাই তো, দুর্জয়ই তো তাকে উপদেশ দিয়েছিলো। সে তবে এমন অস্থির হ'য়ে পড়ছে কেন? করতোয়ার তন্দ্রা কেটে গেলো—তার চোখের সমুখে শুকতারা তখন দপ্ দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে! সে কি, কাবেরী এখনো আসেনি? করতোয়া তার পাশে তাকালো, নাঃ, কেউ নেই! পঞ্চবটীর গাছে একটা শকুন পাখা ঝাপটাচ্ছে। চারদিক পরিষ্কার হ'য়ে গেছে! কই, তার তো মরা হ'লোনা! কাবেরীও তো এসে পৌঁছালোনা। এ যে বড় বিপদ হ'লো তার! মরা যখন একান্তই হ'লোনা, আর মরেও তবে কাজ নেই। দুর্জয়ের উপদেশ মতোই না-হয় সে অদৃষ্টের মুখ চেয়ে ব'সে থাকবে। তাতে ক্ষতি কি আছে। এখন সে বাসার দিকে যাবে নাকি? কিন্তু ফিরেই-বা যাবে কেমন ক'রে?—যে অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে সে এসেছে; সে অন্ধকার তো এখন নেই! আর যদি সে সত্যিই ফিরে যায় আর ইতিমধ্যে কাবেরী যদি এসে ম'রে গিয়ে থাকে, তা হ'লে? করতোয়া ভয়ানক বিপদে পড়লো। কিন্তু আর এখন ব'সে থাকা চলে না। করতোয়া ধীরে ধীরে এমব্যাঙ্কমেণ্ট ডিঙ্গিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলো—শহরের দিকে যেতে সে পারলো না, সোজা চ'ললো চারঘাটের পথ ধ'রে বরাবর। সে কিন্তু ঠিক জানে না, সে যাচ্ছে কোথায়, কিংবা কত দূরে।

এ দিকে দুর্জয় কিন্তু এসে পৌঁছে গেছে। আসামে মেলেই সে কলকাতা থেকে রওনা হ'য়েছিলো, কিন্তু মাঝ পথে মেলভ্যানের চাকা

গরম হ'য়ে প্রায় আগুন ধ'রে ওঠার জোগাড় হওয়ায় মেরামত করতে আর ঠাণ্ডা করতে প্রায় সাত ঘণ্টা দেরী। নাটোরে এসে বাস্ পেলোনা। রাত তখন প্রায় বারোটা বেজেছে। করতোয়া যখন বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লো, তখন দুর্জয় চাপলো টমটমে। যখন তার টমটম পুঠিয়ার চৌরাস্তা পার হয়েছে, সেই মহূর্তে করতোয়া পঞ্চবটী ডিঙিয়ে নদীর কিনারায় ব'সলো। শিবপুর হাটের গা দিয়ে অন্ধকার ভেদ ক'রে যখন একটা টমটম্ ঝুমঝুমি বাজিয়ে বাজিয়ে এগিয়ে চ'লেছে, করতোয়া তখন কাবেরীর জন্য উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায় ব'সে।

শহরের মধ্যে যখন টমটম এগিয়েছে, যখন পেছনে তেলীপাড়া রেখে, বাঁয়ে রেখে সাগরপাড়া, ডানে রেখে শিরোলের জঙ্গলে যাবার রাস্তা, টমটম চ'লেছে ঘোড়ামারার দিকে, রাত তখন তিনটে বাজে। তখন গভীর হ'য়ে করতোয়া সেই ঝরনার কথা ভাবছে, ভাবছে দুর্জয়ের সেই উপদেশের কথা।

দুর্জয় ভাবছিলো, এত রাত্রে কি-ব'লে সে দরজায় আঘাত দেবে। সকলে ঘুমিয়ে অচেতন হ'য়ে আছে নিশ্চয়। করতোয়ার সঙ্গে এই রাত্রে তার দেখা হবে না, সেও এখন নিবিড় হয়ে ঘুমাচ্ছে অনিবার্য। আর কাবেরী কি করছে ?

টমটম বাঁয়ে মোড় ঘুরলো। পাব্লিক লাইব্রেরীর সমুখে টমটম দাঁড় করিয়ে, ভাড়া মিটিয়ে সরু গলি ধ'রে দুর্জয় এগিয়ে গেলো। খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর তার বড় আশ্চর্য ব'লে বোধ হ'লো। বুকটা কেঁপে উঠলো। সে তবে তারিখ ভুল ক'রেছে নাকি ? আজ রাত্রেই কি করতোয়ার বিয়ের কথা ছিলো ? লোকজনে বাড়ি যে গমগম করছে। সমস্ত বাড়িময় জ্বলছে অজস্র বাতি।

দুর্জয়ের গলার কাছে যেন তার হৃৎপিণ্ড উঠে এসে ধ্বক্ ধ্বক্ করছে। বুকের মধ্যেটা যেন একেবারে ফাঁকা। দুর্জয় এগিয়ে গেলো।

কাকা ব্যস্ত হ'য়ে ঘোরাফেরা করছেন। দুর্জয়কে দেখেও দেখলেন না। সে কি? দুর্জয় আস্তে আস্তে অন্দরের দিকে গেলো। সেখানে মেয়েরা সবাই মাথায় হাত দিয়ে ব'সে। দুর্জয় অবশেষে শুনলো, করতোয়াকে পাওয়া যাচ্ছে না! সে কি? পাওয়া যাচ্ছে না মানে? দুর্জয় তো এর কোনো মানে পাচ্ছেনা। বড় অবিশ্বাস্য ঘটনা ব'লতে হবে।

রাত যখন প্রায় নটা (দুর্জয় তখন সাদা ব্রিজের ওপারে) তখন কাকা নাকি করতোয়া আর কাবেরীকে ব'সে গল্প করতে দেখেছিলেন। তারপর থেকে আর দেখছেন না। কাবেরীকে জিজ্ঞেস করলে সে ব'লছে—জানি না তো!

দুর্জয়ও প্রায় মাথায় হাত দিয়ে ব'সলো। মনে-মনে সে কত-কি এঁটে এসেছে, কিন্তু হঠাৎ এ কি হ'য়ে গেলো?

বরযাত্রীরা বর নিয়ে এসে হাজির হ'য়েছে প্রায় রাত বারোটা নাগাদ। (করতোয়া কিন্তু তাদের আসাতেই আরো অধৈর্য হ'য়ে প'ড়েছিলো এবং তখনি সে গায়ে চাদরটি জড়িয়ে বেরিয়ে প'ড়েছে, কিন্তু কাবেরী আর বেরুতেই পারলোনা)। বরযাত্রীদের মধ্যে তো যা-তা আলোচনা আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে এ নিয়ে। করতোয়াকে নিয়ে তারা কুৎসিত গল্প বানাতে আরম্ভ ক'রেছে।

এদিকে করতোয়া যখন চারঘাটের রাস্তা ধ'রে এগিয়ে গেছে অনেকটা, তখন তার পেছনে সমস্ত শহরে তার নামে নানাবিধ কুৎসা

রটনা আরম্ভ হয়েছে। চায়ের দোকান, রানীবাজারের মোড়, মালোপাড়ার তে-মাথা সব এক মাথা হ'য়ে একই কথা বলছে। ব'লছে, বিয়ের ক'নে রাতারাতি স'রে পড়লো, শহরের ইতিহাসে এই প্রথম।

বরযাত্রীরা আর দেরী করলোনা, ভাবগতিক সুবিধে নয় দেখে তারা গোটা আট বেলার সময় মোটর চেপে, বরকে নিয়ে চ'লে গেলো।

দুর্জয় অনেকক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে ব'সে রইলো। করতোয়ার কথা ভেবে তার দুঃখও যেমন হচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ চিন্তায় সে তাকে ঘৃণাও না ক'রে পারছে না। যে-করতোয়াকে সে এত দিন এত রকমে ভালোবেসে এসেছে মনে-মনে, অকস্মাৎ সে এমন একটা কেলেঙ্কারি করে ব'সলো ?

কাকা এতক্ষণ দুর্জয়কে বিশেষ আমল দিচ্ছিলেননা। কিন্তু এখন অতি আন্তরিক গলায় তাকে ডাকলেন, একটু ওপরে উঠে এসো তো, দুর্জয়। কয়েকটা কথা আছে!

দুর্জয় কাকার সঙ্গে ওপরের ঘরে গেল। তিনি দুর্জয়ের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, তাঁর চোখ একটু সজল হ'য়ে উঠলো। ব'ললেন, এখন কি করা যায়, বলো। আমি তো ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছি নে। বিয়ের সব বন্দোবস্তই তো হ'য়ে আছে। ওরা সব গালাগালি দিতে দিতে চ'লে গেল। ব'ললাম আর একটি মেয়ে আছে তার সঙ্গেই না-হয় আজ রাত্রে বিয়ে দিচ্ছি। তাও তারা শুনলে না, ব'ললে—এ সব ঘরে ওরা বিয়ে করে না। কি করি এখন, দুর্জয়!

আতঙ্ক তাঁর আরো প্রবল হ'লো, মনে হলো—কাবেরীর বিয়ে যেখানে ঠিক ক'রেছেন তারাও এ-সব শুনলে নিশ্চয়ই বিগড়ে ব'সবে। এখন উপায়? ব'ললেন, দুর্জয়, কথা বলো।

দুর্জয় উত্তর দিলো না।

পাশের ঘরে কাবেরী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে না? দুর্জয়ের যেন তাই মনে হ'চ্ছে। সে কান খাড়া করলো। কাকারও যেন তাই মনে হ'চ্ছে।

পাশের ঘরে কাকা উঠে গেলেন। শত প্রশ্ন করাতেও কাবেরী কোন উত্তর দিলো না। তার যেন কেবলই মনে হ'চ্ছে, করতোয়ার একটা দেহ জলে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চ'লেছে। কিন্তু এ-কথা প্রকাশ ক'রতে সে রীতিমতো ভয় পাচ্ছে। এ-কথা চিন্তা করতে তার শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা ঠাণ্ডা শিহরণ শিরশির ক'রে মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে যাচ্ছে। কাবেরী শুধু ব'ললো, আমাকে ওখানে বিয়ে দিয়ো না, কাকা!

কাকা হঠাৎ ব'লে ফেললেন, তার মানে?

পাশের ঘর থেকে দুর্জয় কান পেতে সব শুনছে। তার বুকের ভেতরটা দ্রুত আন্দোলিত হ'য়ে উঠ্‌ছে বার বার। করতোয়ার ওপর তার কেমন যেন ঘৃণা বাড়ছে।

কালো একটা বিষাদ ঘুমন্ত বাদুড়ের পাখার মতো বাড়িটার ওপর ঝুলে আছে। কাকার মনেও সে বিষাদ গাঢ় হ'য়ে উঠেছে। করতোয়া আর কাবেরীর বাবা-মা মারা যাওয়ার পর থেকে এদের প্রতিপালনের ভার তিনি গ্রহণ ক'রেছেন, কিন্তু এরা যে তাঁকে এমন বিপদে ফেলবে, এ-কথা তিনি কখনো ভাবেন নি।

কাবেরীর সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাকার কি সব কথাবার্তা হ'লো, দুর্জয় কান পেতে থেকেও কিছু শুনতে পেলো না।

হঠাৎ দ্রুতবেগে কাকা এ-ঘরে ঢুকতেই দুর্জয় কেঁপে উঠলো। কাকা সজোরে তার হাত ধ'রে ব'ললেন, দুর্জয়, আগে প্রতিজ্ঞা করো।

দুর্জয় এর কোনো অর্থ বুঝতে পারলো না। কাকা ব'ললেন, প্রতিজ্ঞা করো, আমার কথা রাখবে? আমি তোমার বাবার মত নেবো, এক্ষুনি টেলিগ্রাম করছি। তুমি আগে কথা দাও!

—কি কথা বলুন!

—তুমি কাবেরীকে বিয়ে করবে, এবং আজই। সব বন্দোবস্তই আছে, কেবল তুমি কথা দেবে! কাকা অধীর গলায় ব'ললেন, আর দ্বিরুক্তি ক'রো না, দুর্জয়।

দুর্জয় একটু ভাবলো, না, ভাবার সে ঠিক সময় পেলো না। ব'ললো, কাবেরীর মত?

—আছে। সে জন্যে চিন্তা নেই; আমি বন্দোবস্ত করছি। দুর্জয়, ব'সো একটু, আমি এলাম ব'লে!

দুর্জয় ভাবছে সেই কবিতাটির কথা, সেই কার্সিয়াঙে ব'সে কাবেরী যে কবিতা লিখছিলো! সত্যি, কবিতা চমৎকার লেখে কাবেরী। করতোয়ার মধ্যে গুণ এমন আর কি ছিলো? একটি মাত্র তার গুণ যে সে মেয়ে। তার পরিচয়ও সে দিয়ে গেছে!

•

কাবেরী পাশের ঘরে জানালার কাছে উঠে গেলো—উঃ, তার বুকের ওপর থেকে কত বড় একটা পাথর নেমে গেলো। করতোয়ার কথা তার একটু একটু মনে পড়েছে বই-কি, কিন্তু এখন না-হয় সে

সে-কথা ভুলেই থাকলো! দুঃখ করার সময় তো মানুষ অনেকই পাবে, কিন্তু আনন্দ যেটুকু পারো ক'রে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কাবেরীর মনোভাব, সত্যি ব'লতে কি, ঠিক এই রকম দাঁড়িয়েছে। তবু করতোয়ার একটা বিকৃত বীভৎস মৃতদেহ তার চোখে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে বই-কি!

পাশের ঘরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দুর্জয় রীতিমতো গুণগুণ ক'রে গান করছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্যিক শকুন্তলা

অবতরণিকা

শকুন্তলার জীবনে একটি ট্র্যাজেডি আছে। তার লেখার ভেতর সে ট্র্যাজেডির আভাস আমরা অনেক পেয়েছি।—এবং সে আভাস পেয়েছি ব'লেই শকুন্তলা এতো শিগ্‌গির এত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। ভাবপ্রবণ বাঙালীর কাছে জনপ্রিয় হ'তে অবশ্য কঠিন অধ্যবসায়ের দরকার হয় না। পরিমিত পরিমাণে করুণ রসের জোগান দিতে পারলেই অনায়াসে জনপ্রিয়তা অর্জন করা যায়। শকুন্তলা হয়ত এ টেকনিকটা জানে। তাই তার লেখার মধ্যে করুণ রসের প্রবাহটাই নজরে পড়ে বেশি। এদিক থেকে তাকে শরৎচন্দ্রের সমকক্ষ না ব'লে উপায় নেই। করুণ রসই যে একমাত্র রস নয়, শকুন্তলাকে অবশ্য একথা বুঝিয়ে দেবার সময় এসেছে। শকুন্তলাকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাববেন না। তাহ'লে তাকে নিয়ে কাহিনী রচনা অবশ্যই করতাম না। শকুন্তলার সাহিত্যিক চরিত্রের দোষ কোথায়, শুধুমাত্র সেই কথাটা বলার জন্যেই এই নীরস গদ্যের অবতারণা।

শকুন্তলার সাহিত্য-সাধনার মধ্যে একটা গুণের [illegible] বলি। আমাদের বাংলাদেশের মহিলা সাহিত্যিকদের মতো সে[illegible] অবলম্বন করেনি।

শকুন্তলা এখনো সাময়িক পত্রেই লিখছে। গ্রন্থাকারে তার কোন বই বেরোয়নি। বই বেরোবার পরের ইতিহাসও ব'লবো, যখন অন্ধ্র থেকে অপূর্ব তার সূক্ষ্ম সমালোচনা ক'রে পাঠাবে, তাও আপনাদের দেখাবো। কিন্তু সে কথায় আসার আগে আমাকে ব'লে নিতে হবে ট্র্যাজেডির কথা।

অনেকে ব'লবেন, এ ভূমিকাটির মানে হয় না। কিন্তু তাঁদের অর্থহীন কলরবে কান দিতে গেলে আমার বচনা করা আর হবে না। তাই, এবার কার্সিয়াঙের পাম্থাবাড়ির একটি কাঠের বাড়ীতে আমাদের এসে পৌঁছতে হ'চ্ছে।

এখান থেকে আপনারা দূরে তাকালে পাগল হ'য়ে যাবেন। ওই যে তুষারের মতো শাদা মেঘ, তার নীচে পাহাড়ের ওপর আলকাৎরার মতো কালো ছায়া, আরো নীচে তিস্তানদীর বক্র শীর্ণ একটি রেখা, নদীর আশেপাশে ছোট ছোট লাল আটচালা, বহুদূরে উঁচুতে মাঝে মাঝে সহরের নানাবিধ ঘরবাড়ী সোপানের মতো ধাপে ধাপে উঠে গেছে ; সব শেষে এই যে বাতাস, কখনো নিশ্বাসের মতো, কখনো সোহাগের মতো, আবার কখনো-বা এক টুকরো হাল্কা হাসির মতো

আপনাদের গায়ে এসে লাগছে, এতে উদ্‌ভ্রান্ত যে না হয়, তার দিকে নজর রাখা দরকার, কারণ আগামী কাল সে মানুষ খুন করতে পারে। কিন্তু যে এ-সবের দিকে মন দেওয়ার অবকাশ পায়নি তার কথা যদিও স্বতন্ত্র। যে তাকায়নি, যে মন দেয়নি, বুদ্ধিমান সেই, কারণ সে উদ্‌ভ্রান্ত হবার সুযোগ পাচ্ছে না, সে খুন করবে আশঙ্কাও নেই তা হ'লে।

শকুন্তলা আর দিলীপকে আমরা তাই বুদ্ধিমান বলছি। পৃথিবী ব'লে যে একটা পদার্থ এ পৃথিবীতে আছে, পাহাড় ব'লে যে একটি বিশাল শিলাখণ্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশে হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে, বাতাস ও মেঘের গতাগত নামক কোনো প্রকার নৈসর্গিক প্রক্রিয়া যে চ'লছে, এ-সব কথা আপাততো তারা ভুলে আছে। তারা দু'জন কেবল মাত্র দু'জনেরই অস্তিত্ব স্বীকার ক'রছে এখন।

শকুন্তলা বলছে, কিন্তু করাচি যাবার আগে তুমি ব'লে যাও—সপ্তাহে অন্তত একখানা ক'রে চিঠি দেবে।

দিলীপ ইজি-চেয়ারে চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে ছিলো, ব'ললো, দেবো।

শকুন্তলা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলো, পরে ব'ললো, শেষ-বেশ কথার ঠিক থাকলে হয়।

—পাগল! এই সামান্য কথার ঠিক থাকবে না! দিলীপ ম্লান হেসে ব'ললো, এটুকু ভুলে যেয়োনা-যে চিঠি দেওয়ার গরজ আমারি থাকবে বেশি। তোমরা দেশের মধ্যে থাকবে, আত্মীয় থাকবে, বন্ধু থাকবে, কিন্তু আমি?—আমি তো সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে সেখানে সম্পূর্ণ একা হ'য়ে পড়বো। সঙ্গিহীন মানুষ

বাঁচতে পারে না, একথা জানো। চিঠির মারফৎ ব্যবধানের স্বত্তো একটু ছোট ক'রে নিতে—

শকুন্তলা ব'ললো, মানি।

পাশের ঘরে নিখিলবাবু কেশে উঠলেন।

শকুন্তলা দরজার দিকে তাকিয়ে ব'ললো, বাবার ঘুম ভেঙেছে হয় ত। দাঁড়াও, দেখে আসি। চা করবো এখন? শকুন্তলা উঠে দাঁড়ালো।

দিলীপ বললো, চা-ময় দেশে চায়ে বিতৃষ্ণা ধ'রেছে। একটু কোকো খাওয়াও দেখি।

শকুন্তলা স্তিমিত হাসতে হাসতে, ঝুলন্ত আঁচল কাঁধে তুলে নিতে নিতে চ'লে গেলো।

দিলীপ পাশে হাত বাড়িয়ে একটা পেন্সিল নিলো। স্বভাবতই সে চঞ্চল, এক মুহূর্ত চুপচাপ একা ব'সে থাকতে তাকে দেখা যায় না। পেন্সিলের শক্ত শিষ্ দিয়ে সে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখে দাগ কাটতে আরম্ভ ক'রলো।

নিখিলবাবু আবার কাশলেন, কাঠের দেওয়াল ডিঙিয়ে তাঁর ভারি গলা শোনা গেল।

শকুন্তলা ফিরে এসে ব'ললো, জল চাপিয়ে এলাম। বাবারও ঘুম ভেঙেছে, এক ঢিলে দুই পাখী মারবো।

আপনারা অনেকে লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, যে-শকুন্তলার হাসিখুসি মেয়ে ব'লে খ্যাতি আছে, আজ সে বিষণ্ণ, আজ সে কিছুতেই হাসচে না। যদি বা কখনো হাসচে, সে হাসি নিষ্প্রভ, সে হাসি জ্যোতিঃহীন।

শকুন্তলা ডাকলো, বাহাদুর!

চাকর আসতেই তাকে কিছু খাবার আনতে পাঠাচ্ছিলো। কিন্তু খাওয়ার বিষয়ে দিলীপ চিরদিনই বাধা দিয়ে থাকে, আজো ব'ললো, ভদ্রতা করছো তো? এতে যে তুমি আমাকে তোমার আপন ব'লে স্বীকার করে নিচ্ছো, তা প্রমাণ হ'বে না কিন্তু। ভদ্রতা তুমি অন্য কারুর সঙ্গে ক'রো, আমার সঙ্গে ক'রো না, শকুন্তলা।

—ভদ্রতা নয়! শকুন্তলা বাহাদুরকে ঠেলে দিলো: যা তুই, আন্ গিয়ে। (দিলীপকে) ছ-মাসের মতো তুমি চ'লে যাচ্ছো, একটু খাওয়াতে হয়।

দিলীপ ব'ললো, শুধু ছ-মাস ভাবছো কেন, চিরদিনের মতোও তো হতে পারে।

শকুন্তলা পাথর হ'যে দাঁড়িয়ে গেলো। দিলীপের কথাটি তার কানে অতি নিষ্ঠুর শোনালো। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দিলীপের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সে কি-যেন ব'লতে গেলো, পারলো না আদৌ।

শকুন্তলার মুখের দিকে তাকিয়ে দিলীপ চীৎকার ক'রে হেসে উঠলো, ব'ললো, একেবারেই ছেলেমানুষ।

শকুন্তলা একটু থেমে ব'ললো, আমি না তুমি! ব'লতে ব'লতে সে চ'লে গেলো।

নিখিলবাবু উঠে এলেন। তোয়ালে কাঁধে ফেলে এ-ঘরে এসে ব'ললেন, কি দিলীপ, অত হাসচো যে! খুব স্ফূর্তি হ'য়েছে বুঝি, উড়োজাহাজ চালাবে ব'লে! আজই রাত্রে যাচ্ছো নাকি?

দিলীপ চেয়ারের মধ্যে ন'ড়ে ব'সে সবিনয়ে ব'ললো, হ্যাঁ, আজকেই যাবো।

নিখিলবাবু পাশের একটি চেয়ার শব্দ ক'রে সরিয়ে ব'সে পড়লেন। ব'ললেন, তা ভালো কথা! কতদিন লাগবে শিখতে? মাস ছয়? তা ভালো কথা!

দিলীপ ব'ললে, বেশিও লাগতে পারে। শুধু পায়লটিং শিখতে কম সময় লাগতো, কিন্তু গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্রস্‌কান্ট্রি ফ্লাইট্ শিখতে গেলে সময় আরো বেশিই লাগবে মনে হয়।

নিখিলবাবু ব'ললেন, ওঃ, অনেক বুদ্ধি এঁটেছো মনে মনে তা হ'লে! তা ভালো কথা। কিন্তু কোনো রিস্কএর মধ্যে যেয়ো না, সাবধানে চালিয়ো। এই যে চা, ওকি চা করিসনি? কোকো? এ-বুদ্ধি মন্দ না।

শকুন্তলা কোকোর বাটি দু'জনের কাছে ধ'রে দিলো। বাহাদুরের ওপর তার রাগ কি কম হ'চ্ছে এখন? রাস্কেলটা সেই কখন গেছে এখনো এসে পৌছতে পারলো না।

নিখিলবাবু ব'ললেন, শান্ত, তোর মুখ অত ভার ভার কেন রে?

শকুন্তলা ব'ললো, কই, না তো! তোমার তো আর কাজ নাই, তুমি মুখ ভার ভারই দেখে বেড়াও।

নিখিলবাবু হেসে ব'ললেন, তা ভালো কথা! মেজাজটা যেন আজ একটু চড়া দেখছি। কি হ'য়েছে জানো, দিলীপ?

দিলীপ থতমত খেয়ে গেলো, ব'ললো, কই নাঃ! আমি তো জানি না!

ও-ঘর থেকে মা ডাকলেন, শান্ত!

পাশের ঘর থেকে বাহাদুর ডাকলো, মা-জি।

ছ্যাৎ, শকুন্তলার অত ডাক-হাঁক ভাল লাগছে না। কেন, বাহাদুর খাবার নিজে গুছিয়ে আনতে পারছে না? না-হয় মায়ের কাছে নিয়ে গেলেও তো পারে? একেই তার আজ কিছু ভাল লাগছে না, তার ওপর সব্বার তাকে শুধু শুধু বিরক্ত করা। শকুন্তলা দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

মা ব'ললেন, এই দেখ, কলকাতা থেকে চিঠি এসেছে। মন্টি লিখেছে, তোর ছোটমাসিমা। তোর মেশোমশাই একটা কাগজ বের করছেন, তোর লেখা চান্।

শকুন্তলার ভয়ানক বিরক্ত লাগলো, ব'ললো, লেখা চায়! চাইলেই হ'লো! পারবো না দিতে। কি কাগজ, কি বৃত্তান্ত ঠিক নেই, লেখা! আগে কাগজ পাঠিয়ে দিতে ব'লে দাও।

মা অপ্রস্তুত হ'য়ে ব'ললেন, তা, আমার ওপর ঝাল ঝাড়ছিস্ কেন? আমি কি করলাম তোর?

বাহাদুর দরজার কাছে খাবার হাতে দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে, তাকে দেখেই শকুন্তলার গায়ে আরো জ্বালা ধ'রলো, ব'ললো, ভূত, দাঁড়িয়ে আছো কেন? ও-ঘরে গিয়ে প্লেটএ গুছোও।

বাহাদুর চ'লে গেলো!

শকুন্তলা এ-ঘরে এসে দেখে দিলীপ একা ব'সে। শকুন্তলা জিজ্ঞেস করলো, বাবা গেলেন কোথায়?

দিলীপ বুড়ো আঙুল দিয়ে পাশের ঘর দেখিয়ে দিলো।

শকুন্তলা জিজ্ঞেস করলো, এখন বেরোবেন বুঝি বাবা?

দিলীপ ঠোঁট উল্টে জানালো, সে জানে না।

এতে শকুন্তলার আরো বিশ্রী লাগলো। কেন, দিলীপ কি কথা বলতে জানে না? সে কি মাছের মতো বোবা হয়ে গেছে নাকি? —যে, ইসারায় ইঙ্গিতে কাজ সারছে! শকুন্তলাও আর কোন কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। কিছুক্ষণ সে অপেক্ষা করলো বাহাদুরের। আসছে না দেখে শকুন্তলা আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ও-ঘরে গিয়ে দেখে বাহাদুর নির্বিকারে সম্মুখে প্লেট নিয়ে ব'সে আছে। এমন বোকাও কি সংসারে থাকে? শকুন্তলার রাগের পরিবর্তে দুঃখ হ'লো। একটু থেমে ব'ললো, কি, নিয়ে যেতে পারলি না এখনো?

বাহাদুর চমকে উঠে ব'ললো, যাউন্দেইছু!—ব'লেই সে ছুটে গেলো।

শকুন্তলা আর না হেসে পারলো না। কিন্তু আপনারা তার মুখের ভাব লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন, হাসতে তার অসহ্য কষ্ট হচ্ছে।

শকুন্তলা আবার দিলীপের কাছে গেলো। দেখে, দিলীপ চোখ প্রায় বুজে চাপা গলায় গান করছে, সম্মুখে প্লেট আছে, বাহাদুর নাই। এক গ্লাস জলও দেয়নি বাহাদুর। যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো তেমনি নিঃশব্দে শকুন্তলা আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। নিজেই এক গ্লাস জল এনে দেখে, দিলীপ তখনো চোখ প্রায় বুজে ব'সে ব'সে কি যেন ভাবছে। তাকে ডাকতে শকুন্তলার ভালো লাগলো না, কিন্তু নিজের উপস্থিতি কি ক'রে ঘোষণা করবে বুঝতে না পেরে জলের গেলাসটি শব্দ ক'রে রাখতেই দিলীপ তাকালো। কিন্তু তাকিয়েই তখনি

আবার সে চোখ বুজলো। এই যে আজ সে চ'লে যাচ্ছে বহু দিনের জন্যে, এ চ'লে যাওয়ার মধ্যে তার আন্তরিক কোন আসক্তি আছে কি না সেই কথাই দিলীপ ভাবছে। কাকে ছেড়ে কে না যায়, কে না গিয়েছে। আজ শকুন্তলাকে ছেড়ে সে যে যাচ্ছে তাতেই বা তার এতো বেদনা কেন? কেনই বা সে নিজে মনের মধ্যে স্বেচ্ছায় একটি সুগভীর ক্ষত সৃষ্টি করছে। সে জানে, Roses have thorns and silver fountains mud। তার শুভ যাত্রার আড়ালে অকুশল কোনো ইঙ্গিৎ যদি থেকেই থাকে, তাতেই বা ক্ষতি কি? যদি এমন হয়, বছর খানেক পরে সে ফিরে এসে দেখলো—শকুন্তলা অন্য কোনো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে নিতান্ত নিরিবিলি ঘর-সংসার পেতে বসেছে, দিলীপ আসতেই সে সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটির সঙ্গে দিলীপের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, তাতেই বা ক্ষতি কোথায়? দিলীপ আবার ভাবে, কিছু দিন পরে ফিরে এসে যদি সে দেখে শকুন্তলা এদেশে নেই, কোথায় গেছে তার বাবা-মা তা জানেন না, কেঁদে কেঁদে তাঁদের চোখ ফুলেছে, খোঁজ পান্‌নি। তাতেই বা ক্ষতি কোথায়? বলা যায় না, কে কখন কি রকম হয়ে যায়! মানুষ তো কলের মতোই চলা ফেরা করে, কল কখন নষ্ট হ'য়ে যাবে বলা সোজা নয়। পাঁচ হাজার ফিট উঁচুতে উঠে এরোপ্লেন নিরিবিলি চ'লতে চ'লতে হঠাৎ কি হয়, কল যায় বন্ধ হ'য়ে মুখ গুঁজে সোজা পড়ে মাটিতে, ভেঙে হয় চুরমার। কিন্তু সেই প্লেনটাই আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এসেছে।

শকুন্তলা আর কথা না বলে পারলো না, বললো, আটলান্টিকের স্বপ্ন দেখছো বোধ'য়? কবে পাড়ি দিতে পারবে তাই ভাবছো

নিশ্চয়ই। তাই তো বলি, মানুষকে মানুষের ভুলতে বিশেষ দেরী হয় না।

দিলীপ কাঠ হ'য়ে শকুন্তলার দিকে তাকালো, বললো, যথা।

—যথা, এই তো দেখছি! সামনে ব'সে থাবা সত্ত্বেও ভুলে যাচ্ছো, আর তফাৎ হ'লে কি কথা আছে? প্রলোভনের তো অভাব নেই মানুষের।

—প্রলোভন? কি যে বলো! বিদেশে গেলেই ছেলেরা যে মেয়ের পাল্লায়—

—থাক হ'য়েছে! প্রলোভন ব'লতে সুধু মেয়েই বোঝায় না। শকুন্তলা স্নেহার্দ ভৎসনায় বললো।

দিলীপ দুটো টানাটানা অপ্রস্তুত চোখ দিয়ে শকুন্তলার দিকে তাকালো, কি যে ব'লবে সে কিছু ভেবে পেলো না। তার ঠোঁটের কিনারে ছোট্টো একটা হাসির ঢেউ আঘাত দিয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে দিলীপ বললো, তা বটে। প্রলোভন বলতে সুধু মেয়েই বোঝায় না। কিন্তু আমার একটা কি রকম যেন ধারণা ছিলো যে প্রলোভন কথাটা শোনা মাত্র আমার চোখে যে কোনো একটা মেয়ে ভেসে উঠতো। অবশ্য তার মধ্যে একটিও তুমি নও।

শকুন্তলা একটু থেমে বললো, একটিও নও মানে?

—মানে, তুমি তো প্রলোভন দেখাও না আমাকে, সেই কথা বলছি। দিলীপ হাসলো।

শকুন্তলা ব'ললো, ওঃ! কিন্তু এবার এটুকু খেয়ে নাও দেখি!

—কি? খাবার? নিশ্চয় খাবো! কেন নয়! কিন্তু মিতু—

শকুন্তলা সমস্ত শরীর নাড়িয়ে বলে উঠলো, কিন্তু কিন্তু চলবে না! সবটুকু তুমি একা—

দিলীপ হাসলো। খেতে খেতে ব'ললো, চলো একটু বেড়িয়ে আসি গিয়ে। অনেক দিনের মত পাহাড়টাকে ছেড়ে যাবো, একটু দেখে আসি।

শকুন্তলা ব'ললো, কোন্‌দিকে যাবে?

—কেন, ডাওহিল্! কার্সিয়াঙের যদি রূপ দেখতে হয়, তবে ঐ একটি জায়গা! আর কার্সিয়াঙ না দেখে শুধু মেঘ দেখতে চাও তবে চলো রাইফল্ রেঞ্জ গ্রাউণ্ডে। কার্সিয়াঙে তো মাত্র এই দুটি জায়গা আছে যাওয়ার! ওঃ ইয়েস, আর একটা দুরবীণদাঁড়া, কিন্তু এখন ত আর ভোর নয়, ওখান থেকে দেখবো পাহাড়ের সকালের রূপ। কোথায় যাবে ঠিক ক'রে নাও তবে!

শকুন্তলা একটু থেমে বললো, সব ছেড়ে দিয়ে চলো খাদে নামি। কতটা নামতে পারা যায় দেখি!

—কিন্তু ওঠবার সময়? আমি কিন্তু সে দিনকার মত টেনে টেনে আনতে পারবো না! তোমাকে ঐ রকম টানা দেখে চা-বাগানের ডাক্তারবাবু যা হাসছিলেন।

শকুন্তলা বললো, তবে চলো ইয়ে পর্যন্ত বেড়িয়ে আসি। কি বলে গিয়ে—কোয়েরি!

—বেশ তাই, বেড়ানো নিয়ে কথা। আর ওদিকটাও মন্দ নয় নেহাৎ!

কিছুক্ষণ পরে তাদের দুজনকে আমরা আর ঘরের মধ্যে পেলাম না। পেলাম তাদের প্রকাণ্ড একটা আকাশের নীচে, যে আকাশের

নীচে অপ্রশস্ত একটা কালো পীচের রাস্তা এঁকে বেঁকে কাৎ হ'য়ে ঢালু হয়ে ঘুম পাহাড়ে উঠে দার্জিলিঙে নেমে গেছে। তাদের আমরা পেলাম সেই রাস্তার একটি বাঁকের মুখে চুপচাপ ব'সে থাকা অবস্থায়। সেই বাঁকটিকে বহুবিধ নাম-না-জানা পাহাড়ি গাছ ঝেঁপে ধ'রে অন্ধকার ক'রে রেখেছে। বাঁকের মুখে একটু বাঁধান জায়গায় তারা ব'সে আছে চুপচাপ। আজকের এই প্রত্যাসন্ন বিচ্ছেদের অনিবার্যতায় তারা মূক হ'য়েছে। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্যে মূক হওয়া মূর্খতা মাত্র, অবশ্য এ ক্ষেত্রে; কারণ দিলীপ যে আজ চলে যাচ্ছে! আর তিন ঘণ্টা পরে সে যে শকুন্তলার সঙ্গ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে যাবে।

দিলীপ ব'ললো, এমনো হ'তে পারে, হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হ'লাম। বলা যায় না কিছুই। বিকেলে ঘুম থেকে উঠেই যেন দেখলে, তোমাদের বাড়ির ওপর দিকে ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে একটা এরোপ্লেন। ধরো, প্রায় ছাদ পর্যন্ত নেমে এসেছে, এবং তার পাইলট আমিই।

—কল্পনা আর সহ্য হচ্ছে না আমার! শকুন্তলা গাঢ় একটা নিশ্বাস ফেলে ব'ললো, খানিকক্ষণ পৃথিবীতেই বাস করা যাক্।

—কেন, তুমি সাহিত্যিক! তুমি তো আকাশ থেকে নায়ক আনো, বাতাস থেকে নায়িকা আনো। তোমার পৃথিবীর ওপর এতো মোহ হওয়া তো স্বাভাবিক নয়! দিলীপ শকুন্তলার একটু কাছে স'রে ব'সলো।

শকুন্তলা দিলীপের হাঁটুর ওপর হাত রেখে ব'ললো, বাজে কথা আর বলো না, এই আমার অনুরোধ তোমার কাছে। সেদিন নাকি দুটো এরোপ্লেন ধাক্কাধাক্কি ক'রে চুরমার হ'য়েছে?

—হয়েছেই তো! কেন বল তো?

—না এমনি।

—এমনি নয়। দিলীপ ব'ললো, আমাকে নিয়ে তোমার আশঙ্কা হচ্ছে তো? না হয় মরবো, তাতে আপত্তি কি আছে? তোমার প্রেম দিয়ে চিরদিন তুমি নিশ্চয়ই বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

শকুন্তলা অস্পষ্ট গলায় বললো, তবু যে ক'দিন বাঁচিয়ে রাখা যায়।

—এক মুহূর্তও কেউ বাঁচাতে পারে না, শান্ত! দিলীপ নিশ্বাসের ভেতর দিয়ে বললো।

ওপর থেকে গড়াতে গড়াতে একটা ট্রেন ঢালু পথে নেমে গেলো। একটু গিয়েই খানিকটা মেঘের ভেতর অদৃশ্য হ'লো।

দিলীপরা তাকিয়ে দেখলো, ওপর থেকে গড়াতে গড়াতে চাপ চাপ মেঘ তাদের দিকে নেমে আসছে। কতকগুলো কুলি মেয়ে কপালে নামলো বাঁধিয়ে পিঠের ওপর বোঝা নিয়ে মাথা হেঁট ক'রে দৌড় দিচ্ছে। দিলীপ বুঝতে পেরেছে, এ মেঘ জলে ভরা, এক্ষুনি বৃষ্টি হবে। শকুন্তলার হাত ধরে তাড়াতাড়ি ও উঠে পড়লো, ব'ললো —শিগ্‌গির ছোট, নইলে ভিজতে হবে। ছুটে মেঘটুকু কোনো রকমে পার হ'য়ে নাও।

দিলীপ শকুন্তলার হাত ধ'রে ছুট দিলো। কিন্তু বৃষ্টি ততক্ষণে আরম্ভ হয়ে গেছে। তারা দু'জন তবু ছুটছে, কিন্তু মেঘের মধ্যে থেকে বেরোবার আগেই তারা ভিজে একাকার হ'য়ে গেল।

অবশেষে মেঘ অতিক্রম ক'রে তারা বেরিয়ে এলো ফাঁকায়। এখানে রাস্তা শুক্নো, আকাশ পরিষ্কার। তারা পেছনে তাকিয়ে

দেখলো, তাদের থেকে হাত পাঁচেক দূরে মেঘের রাজ্য, সেখানে তখনো বৃষ্টি হ'চ্ছে নাগাড়ে।

দিলীপ বললো, উঃ, খুব ভিজে ওঠা গেলো। এই নাও, রুমাল দিয়ে মুখটা মোছ দেখি।

শকুন্তলা রীতিমতো খিলখিল ক'রে হাসচে। এই বৃষ্টি হঠাৎ যেন তার দেহ থেকে পুরোপুরি পাঁচটা বছর ধুয়ে নামিয়ে দিয়ে গেছে। নিতান্তই খুকির মতো আহ্লাদী সুরে বললো, আমি আরো ভিজবো। চলো ফিরে যাই! চলোইনা, দ্যুৎ।

দিলীপ তার কাঁধের ওপর দিয়ে হাত দিয়ে ব'ললো, অত ছেলেমানুষী কেন?

—না, ছেলেমানুষী নয়, তুমি চলো। রীতিমতো আব্দার আরম্ভ করলো শকুন্তলা।

দিলীপ ব'ললো, বেশী ভিজলে নিমুনিয়া হবে যে।

—হোক! তোমার কাছে এই আমার শেষ অনুরোধ আজকে। যাবে কিনা বলো!

—আচ্ছা চলো। কিন্তু শীত করছে আমার।

—করুক। বাসায় গিয়ে তোমাকে কোকো খাওয়াব গরম গরম। চলো। শকুন্তলা দিলীপের হাত ধ'রে টানতে আরম্ভ করলো।

কিন্তু বৃষ্টি ততক্ষণে থেমে গেছে, মেঘগুলো গড়াতে গড়াতে নামতে আরম্ভ ক'রেছে সিঙ্গেলের চা-বাগানের দিকে।

বৃষ্টি তো থামলো, কিন্তু দিলীপের হঠাৎ একী হ'লো? আগে থেকেই সে শকুন্তলাকে আকর্ষণ করছিলো, এখন প্রায়

আক্রমণ সুরু করলো যে। শকুন্তলা বাধা দিতে গেলে কাঁপা এবং ভারী গলায় দিলীপ ব'ললো, এ-ও আমার শেষ অনুরোধ আজকে।

নির্জন গিরিপথে, ধূসর সন্ধ্যার সাক্ষ্যে দিলীপ শকুন্তলাকে দীর্ঘ ও উত্তপ্ত একটি চুমো খেলো। তারপর শকুন্তলা দিলীপের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বাঁ-হাতের পেছন দিয়ে ঠোঁট মুছে ব'ললো, এ কী হ'লো ?

দিলীপ ব'ললো, কিছু নয়। চলো, এবার ফিরে যাই!

তারপর দু'জনে ছাড়াছাড়ি হ'যে নির্বাক হেঁটে চ'ললো। কিন্তু পর মুহূর্তে বুঝতে পারলো, এ তাদের বোকামি ছাড়া কিছু নয়। যেমন দুটি গ্রহ ক্রমশ উভয়ের নিকটায়মান হ'য়ে বিরাট একটি সংঘর্ষে তফাৎ হ'যে যায়, তারাও তেমনি হ'য়েছিলো। কিন্তু তারা তো গ্রহ নয়, বিকর্ষণ নিয়ে জীবনও তাদের কাটবে না, সুতরাং আবার তারা দু-জন দু-জনের সান্নিধ্য গ্রহণ ক'রলো।

দিলীপ ব'ললো, স্টেশনে আমাকে সি-অফ করতে যাবে তো ?

—যাবো। শকুন্তলা নিষ্প্রভ গলায় ব'ললো।

দিলাপ অর্থহীন আন্তরিকতায় ব'ললো, আমি তোমাকে করাচিতে নিয়ে যাবো। দেরীই বা আর কত বলো। মাস ছয়েক বই তো নয়! (একটু হাসতে চেষ্টা ক'রে) ঘর-সংসার সেখানেই পাতা যাবে!

শকুন্তলা ব'ললো, হুঁ।

বাসায় পৌঁছে শকুন্তলা ডাকলো, বাহাদুর।

বাহাদুর এলে তাকে কোকোর জল বসাতে ব'লে সে কাপড় বদলাতে গেলো। যাবার আগে দিলীপকে কাপড় বদলাবার অনুরোধ

জানানোয় সে রাজী হয়নি। ব'লেছিলো, শুকিয়ে গেছে, দরকার হবে না। তুমি শিগ্‌গীর এসো।

দিলীপের বাসায় আছেন মাত্র তার ছোটকাকা, আর একটি পাহাড়ি ঝি। তার বাবা মা কলকাতায় থাকেন। দিলীপ গরমের ক'টা দিন কাটায় পাহাড়ে। বাসায় যাওয়ার তার তাড়া নেই, কারণ জিনিষপত্র অল্প কিছু যা আছে, তা সে দুপুরেই গোছগাছ ক'রে রেখে এসেছে।

নিখিলবাবু ফিরলেন, ব'ললেন, ব'সে কে? দিলীপ? অন্ধকারে?

অন্ধকারের মধ্য থেকে দিলীপ ব'ললো, এই মাত্র এলাম। এমনি ব'সে আছি অন্ধকারে।

সুইচ টিপে দিয়ে নিখিলবাবু ব'ললেন, তা ভালো কথা! কিন্তু আমি অন্ধকারে এক মুহূর্ত থাকতে পারি নে। বুঝলে? শান্ত কই?

—ভেতরে!

—দু'জনে বেড়িয়ে এলে বুঝি? তা ভালো কথা! ওকি, তোমার জামা ভিজে, এতো ভালো কথা নয়। ভিজলো কি ক'রে! ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন নিখিলবাবু।

—হঠাৎ বৃষ্টি নেমে এলো—

সেদিকে কা'ন না দিয়ে নিখিলবাবু উঁচু গলায় ডাকলেন—ওরে শান্ত, শান্ত! নাঃ, কাণ্ডজ্ঞান কারো নেই! পরো বাবা, এই কাপড়টা কোমরে শীগ্‌গির জড়িয়ে ফেলো দেখি! খোলো, জামাটা খোলো! রক্তের জোর-আর ক'দিনের?

দিলীপ বাধা দিয়ে ব'ললো, এক্ষুণি বাসায় যাবো।

শকুন্তলা দু'হাতে দুটো কাপ নিয়ে আসতে আসতে ব'ললো, বাবা, ডাকছিলে?

নিখিলবাবু চ'টে গেছেন, ব'ললেন, না ডাকিনি। যত সব! কাণ্ডজ্ঞান ব'লে যদি কিছু থাকে। ব'লতে ব'লতে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

এরা দুজন মুখোমুখী ব'সে কোকো খেতে আরম্ভ ক'রে দিলো! শকুন্তলা চুরি ক'রে ক'বে এক একবার দিলীপের মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

হঠাৎ ভেতর থেকে ভয়ানক চীৎকার শুনতে পেলো তারা। নিখিলবাবু প্রাণপণে চেঁচাচ্ছেন, আর শকুন্তলার মা প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা কচ্ছেন, তবু থামাতে পারছেন না।

শোনা যাচ্ছে, নিখিলবাবু ব'লছেন, এটা কি ভালো কথা? এই কি মানুষের কাণ্ডজ্ঞান? ছিছি, আমার নাম ডোবালো, আমার মাথা হেঁট করালো।

মা বলছেন, কি, হ'লো কি? সুধু সুধু চেঁচিয়ে মরছো কেন? কারণটা বলো।

—সুধু সুধু! নিখিল বাবু গ'র্জ্জে উঠলেন, একে তুমি বলো সুধু সুধু? আমার মেয়ে হয়ে সে কাণ্ডজ্ঞানহীনা!

এদের মুখের কাছে কোকোর বাটি থেমে গেছে। শকুন্তলা রীতিমতো হাসছে। দিলীপ থ' হয়ে গেছে। শকুন্তলার না হেসে উপায় কি? এই রকম নিখিলবাবু গোষ্পদে জাহাজডুবি প্রায়ই ঘটিয়ে থাকেন।

নিখিলবাবু প্যাটকরা একখানা কাপড ও একটি গেঞ্জি নিয়ে ঝড়ের মতো ঘবে ঢুকলেন, পেছন পেছন তাঁব স্ত্রী ছুটে এলেন। কি হ'যেছে তিনি কিছুই বুঝতে পাবেন নি।

নিখিলবাবু ব'ললেন, পবো, শিগগির পবো, দিলীপ। প'রে ফেলো! নইলে আমি কিন্তু সত্যি চ'টে যাবো।

দিলীপ শকুন্তলাব মুখেব দিকে তাকাতে লাগলো। শকুন্তলা ইসাবা ক'রে তাকে পবতেই ব'লছে।

মা ব'ললেন, এই? আমি ভাবলাম বুঝি আগুন লেগেছে।

নিখিলবাবু তাঁব দিকে রুক্ষ দৃষ্টি নিযে ব'ললেন, তা নয়? তাবপব যদি নিমুনিয়া ধবে। কাণ্ডজ্ঞান তো সবার সমান!

ভাবগতিক সুবিধে নয দেখে দিলীপ ঘবের ওপাশে গিয়ে জামা কাপড় বদলে ফেললো। নিখিলবাবু ও মা চ'লে গেলেন।

কোকো ঘোলেব সববতেব মত ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। দিলীপ ব'ললো, কি কাণ্ড বলো তো!

শকুন্তলা ব'ললো, প্রথমেই তোমাকে কাপড বদলাতে ব'ললাম, শুনলে না। যাকগে, ভাল ছাড়া মন্দ কিছু হয নি।

দিলীপ উঠে দাঁড়ালো, ব'ললো—এবাব উঠি। বাসা থেকে ঘুবে আসি। (হাতেব ঘডির দিকে তাকিয়ে) সাতটা বেজে গেছে। আব দেরি নেই। কোকো? না, আব খাবো না।

দিলীপ দবজা পর্যন্ত গেছে, পেছন থেকে শকুন্তলা একটা নিশ্বাস ফেললো। ব'ললো, শিগ্‌গির কবে ফি'রে এসো কিন্তু। আমি তৈবী হয়ে ব'সে থাকবো।

দিলীপ ফিরে তাকিয়ে ব'ললো, হ্যাঁ, আমারও তৈরী হ'তে যেটুকু দেরী।

দিলীপ চ'লে গেলো। তৎক্ষণাৎ শকুন্তলার শরীরের মধ্যে কেমন যেন ক'রে উঠলো। সে যেন আর সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সুইচটা টিপে দিয়ে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে বসে শকুন্তলা চোখ বুজলো।

পাশের ঘরে নিখিলবাবু চেঁচিয়ে পলাশীর-যুদ্ধ আওড়াচ্ছেন। আবার তার পরেই পলাশীর-যুদ্ধের যে জায়গাগুলো বায়রনের কবিতার সঙ্গে মেলে, ছাড়া ছাড়া ভাবে তাও আবৃত্তি করছেন।

শকুন্তলা চোখ বুজে ব'সে আছে। আচ্ছা, আজকে তার যেমন মনোভাব, আজকে তার জীবনে যেমন পরিবর্তন ঘটেছে এই নিয়ে ছোট মতো একটা গল্প লিখে মেশোমশার কাগজের জন্যে সে দিব্যি পাঠিয়ে দিলেই পারে। ঠিক, তা-ই সে দেবে। দিলীপের নামকে করবে দীপক, আর নিজেকে অনসূয়া। ঠিক। তারা দুটি বন্ধু যেন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছে, দীপক কখনো অতিরিক্ত কথা ব'লছে, কখনো গম্ভীর হচ্ছে, কখনো-বা আকস্মিক খেয়ালে অনসূয়ার হাতটা চেপে ধরছে। কত আনন্দ করছে তারা! গল্পের পরিণতি সে ঘটাবে কোথায়? হ্যাঁ, ঠিক হ'য়েছে। পা পিছলে দীপক হঠাৎ অন্ধকার খাদের মধ্যে পড়ে যাবে। দারুণ ক্লাইমাক্স হবে তা হলে! কিন্তু হঠাৎ শকুন্তলা চমকে উঠলো, কে?

দরজায় আবার আঘাত দিয়ে দিলীপ ব'ললো, আমি।

শকুন্তলা ক্লান্ত দেহটিকে কোন গতিকে যেন খাড়া করলো। সংযত পদবিক্ষেপে দরজার পাশে গিয়ে সুইচ টিপলো।

দরজার কড়ায় আবার আঘাত পড়তেই শকুন্তলা বললো, খুলি।

ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে দিলীপ ঘরে ঢুকেই ব'ললো, দেরি হ'য়ে গেছে। আর দাঁড়াতে পারবো না। যাবে তো চলো শিগ্‌গির। ব'লতে ব'লতে সে অন্দরে যাত্রা করলো।

এদিকে শকুন্তলা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেনা সে কি করবে। কাপড়টা বদলে নেবে কি? পায়ে লপেটাই থাকলে, না ছিল তোলা জুতোটা শিগ্‌গির করে পরে নেবে? বাবাকে গিয়ে ডেকে আনবে নাকি?

কিন্তু ভাববার বেশি সময় পেলোনা শকুন্তলা, দিলীপ ফিরে এলো, ব'ললো, চলো।

স্টেশন এখান থেকে বেশি দূর নয়। ওরা দু'জন পাশাপাশি দ্রুত পায়ে হেঁটে চ'ললো। আজ এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের মুখে তারা দুজন কোন্ কথা ব'লে উভয় উভয়ের কাছে থেকে বিদায় গ্রহণ করবে, তারা ভেবে পেলোনা। এই অহেতুক মূকতার মধ্যে ডুব সাঁতার দিয়ে তারা পাঞ্জাবাড়ির রাস্তার শেষ সীমায় এসে পড়লো। এখানে রাস্তাটি ডানে এক সমকোণে বাঁক নিয়ে প্রায় খাড়া উঠে স্টেশনের সঙ্গে মিশেছে।

ছোট্টো ভারি এঞ্জিন থেকে অনর্গল কালো ধোঁয়া উঠছে। তাদের দুজনেরই মনে পড়লো, সেই মেঘ-রাজ্যের কথা, যেখানে দাঁড়িয়ে তারা আজ প্রথম চুম্বনের কম্প অনুভূতি হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব ক'রেছে। কিন্তু সে-কথা মনে আনার মধ্যে মধুরতা আর নেই, আছে যেন কোনো ভয়াল সরীসৃপের বিষাক্ত দংশন।

গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে দিলীপ ব'ললো, কলকাতায় কাল পৌছে কালই সন্ধ্যেয় রওনা হবো করাচি! কলকাতা থেকে আর চিঠি দেবো না, বুঝলে? একেবারে করাচি পৌছেই—

—তাই দিয়ো। শকুন্তলা ব'ললো: কিন্তু চিঠি দিয়ো, ভুলে যেয়ো না যেন।

—পাগোল, আবার সেই কথা! দিলীপ প্রাণ খুলে হেসে উঠলো: তুমিও চিঠি দেবে।

—দেবো।

প্লাটফর্মের ওপর জুতোর হিল দিয়ে আঘাত করতে করতে দিলীপ ব'ললো, একটা কথা ব'লবো শকুন্তলা?

শকুন্তলা ব'ললো, বলো!

একটু দ্বিধা ক'রে দিলীপ ব'ললো, করাচি থেকে ফিরে আমি তোমাকে বিয়ে করবো! আসচে অঘ্রাণেই।

শকুন্তলা এর কোন উত্তর দিতে পারলো না। কেবল তার অশুভ কয়েকটি কথা মনে লাগলো—মনে পড়তে লাগলো নানাবিধ বিপদের কথা, উড়োজাহাজের অপমৃত্যুর নানাবিধ ইতিহাস।

পেছন থেকে, এ কে? নিখিলবাবু?—নিখিলবাবু বলতে ব'লতে আসচেন পেছন থেকে—তা ভালো কথা! সেকেণ্ড ক্লাসে যাচ্ছো? এ যুক্তি মন্দ না। আরামে যেতে পারবে। কিন্তু বাবা, সাবধানে থেকো। বিশেষ কায়দা-কসরৎ আরম্ভ ক'রো না যেন প্রথম থেকেই! পাকা হ'য়ে নিয়ে তারপর—

বিনয়ে গ'লে যেতে যেতে দিলীপ ব'ললো, তা তো নিশ্চয়ি। ব'লতে ব'লতে সে গাড়ীতে উঠতে আরম্ভ করলো। এদিকে গাড়ি ছাড়বার উদ্যোগ আরম্ভ হ'য়ে গেছে।

চলন্ত গাড়ীর সঙ্গে শকুন্তলা অনেকটা হেঁটে গেলো, রাস্তা পর্যন্ত এসে গেলো শকুন্তলা। কিন্তু সে কিছু ব'ললো না।

দিলীপ চাপা গলায় ব'ললো—My deepest love to you for ever and for ever.

শকুন্তলা মনে মনে কি ব'ললো জানিনা, মুখে ব'ললো, ভালবাসা জেনো।

ঢালু পথ পেয়ে গাড়ীর জোর বেড়ে গেলো। তীব্র আলোর নীচে দাঁড়িয়ে শকুন্তলা দিলীপের উদ্দেশে রুমাল নাড়তে লাগলো। দিলীপ দরজা দিয়ে শরীরের অনেকটা বের ক'রে সে অভিবাদন গ্রহণ করলো, প্রত্যর্পণও করলো।

এপার ওপার

একটি চিঠি। শুধুমাত্র একটি চিঠিও যদি শকুন্তলা পেতো দিলীপের কাছ থেকে, ত'াহলে তার বিরহের এই দুরন্ত দুর্দিনে সে সেটুকু পরম সান্ত্বনা ব'লে গ্রহণ ক'রে নিতো। দিলীপ সেই যে গেলো, তার পরে তা'র কোনো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? করাচির কোনো ঠিকানাও তো সে দিয়ে যায়নি-যে শকুন্তলা সেখানে একটা তার্ করবে। পথে অশুভ কিছু ঘটেনি তো? রেল অ্যাক্সিডেন্ট তো হামেশাই ঘটছে। কিন্তু দৈনিক কাগজও তো সে রোজই পড়ছে, এমন কোনো সংবাদ্ তো সে দেখেনি আজ পর্যন্ত। তবে দিলীপের চুপচাপ থাকার মানে কি? নিশ্চয়ি সে

ভয়ানক ব্যস্ততার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে তা হ'লে। আবার এমনও হ'তে পারে, দিলীপ তাকে নির্মমরূপে ভুলে গেছে? না, ত' কক্‌খনো হ'তে পারে না! কখনই সে ভুলতে পারে না শকুন্তলাকে। যে-দিলীপ তার হৃদয়ের প্রতিটি নির্জনতায় তাকে সঙ্গী ক'রেছে, যে শকুন্তলাকে তার দেহের প্রতিটি রোমকূপের প্রতিটি শিহরণ দিয়ে উপলব্ধি ক'রেছে, সেই দিলীপ এত সহজে এত সহসা ভুলে যাবে এই শকুন্তলাকে? না, তা হ'তে পারে না। তা হওয়া কল্পনার মতো অসম্ভব। No news, good news বলে একটা কথা আছে না? শকুন্তলা সেই কিংবদন্তীর ওপর এখন আস্থাস্থাপন না ক'রে পারলো না। জীবনের প্রত্যেকটি বায়ুময় নিশ্বাস প্রশ্বাসকে দুশ্চিন্তা দিয়ে বিষময় ক'রে মানুষ আনন্দ পায় না। শকুন্তলাই বা কেন দিলীপের ওপর অকুশল চিন্তার সারহীন সম্ভাবনা আরোপ ক'রে নিজের হৃদয়ে দারুণ ক্ষতের সৃষ্টি করবে? শকুন্তলা উঠে গিয়ে দক্ষিণের জানালাটা তিস্তানদীর ঝিলিমিলি রেখার ওপর খুলে দিলো। বাতাস, ঠাণ্ডা হিম বাতাস, তিব্বতের পথ-অতিক্রম ক'রে আসা বাতাস শকুন্তলার একরাশ কালোচুলের ওপর উপুড় হ'য়ে পড়লো। শকুন্তলার দীর্ঘ উত্তপ্ত নিশ্বাস হ'য়ে এলো সুশীতল। ওই নদী, শকুন্তলা পাটল দুটি চোখ খুলে তাকালো শীর্ণ জল-রেখার দিকে। এখান থেকে প্লেন্ দেখা যায়; ওখান থেকে এখান, উঃ, প্রায় এক মাইল উঁচু! শকুন্তলার দৃষ্টি শিলার পর শিলায় আঘাত খেতে খেতে সুদূরের মাটি স্পর্শ করলো। ওঃ, তাই তো! আজ দশ দিন হ'য়ে গেল, হ্যাঁ, দশ দিন তো হবেই—যে দিন দিলীপ গেল সেই দিনই মাসীমার চিঠি এসেছে লেখা চেয়ে!—আজ দশ দিন হ'য়ে গেল শকুন্তলা সামান্য একটা লেখা পাঠাতে পারলো না! নাঃ, সে বড্ড কেমন যেন হ'য়ে পড়ছে। বাইরের লোক নিশ্চয় বলছে,

শকুন্তলার গর্ব হ'য়েছে লিখতে শিখে! না বাপু, আর দেরী ক'য়ে দরকার নেই। এখনি সে যাহোক কিছু লিখে ফেলবে। তার যেন মনে হ'চ্ছে তার মূড একটু ফিরে এসেছে! শকুন্তলা বুকের কাছে ব্লাউজে আঁটা পেন্‌টা টানতেই খুট শব্দ ক'রে উঠে এলো। দেরাজ টেনে প্যাড নিয়ে সে সেই জানালার কাছে এসে দাঁড়াল, একটু ভাবতে চেষ্টা ক'রে পেছনে তাকিয়ে দেখে, ওদিকের দরজা একেবারে খোলা, বন্ধ ক'রে দিয়ে এলো। হ্যাঁ, গল্প! কি নিয়ে গল্প? প্লটহীন। তা মন্দ নয়, লিখতে তো আরম্ভ করুক, তারপর যেখানে গিয়ে ঠেকে। যেখানে সেখানে গিয়ে যে ঠেকবে না এটুকু আত্মবিশ্বাস তার আছে। শকুন্তলা লিখতে চেষ্টা করলো। কিন্তু শেষ বেশ সে লিখে ফেললো, এ কি? শকুন্তলার মনে মনে হাসি পেলো, তবু সে পড়লো—

> শঙ্কিল মোর পঙ্কিল মন অসুখণ—
> আঁখির আকাশে অকারণে একি বরিখা?
> দগধ হৃদয় বিদগধ তনু মনঃপ্রাণ—
> অজানা দাহের জানো, বঁধু, তুমি অভিধান?
> যে-কথা বহিছে শীর্ণ তটিনী উদাসীন—
> ওগো নির্মম, ওগো নিষ্ঠুর দয়াহীন—
> তুমি কি জানোনো সে-বাণী এ মোর মরমের?
> সে যে কলঙ্ক আমার সরম ভরমের।
> ঝর্ণা আজিও গাহিছে, আকাশ আজো নীল,
> পাহাড়ের মোহ আজিও কমেনি এক তিল।
> কেবল তোমার বিহনে দারুণ অবকাশ—
> সিক্ত মেঘেতে ভরিছে আঁখির নীলাকাশ।

বার দুই তিন প'ড়ে শকুন্তলা মনে মনে হাসলো, অথচ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস না ফেলে পারলো না। যাক্, গল্পই-যে দিতে হবে

তার কী মানে আছে? এই কবিতাটাই এক্ষুণি সে পাঠিয়ে দেবে মেশোমশার কাছে! শকুন্তলা টেবিলের কাছে গিয়ে দেরাজ খুলে খাম বের ক'রে তৎক্ষণাৎ ঠিকানা লিখে ফেললো। তারপর কবিতাটা পরিষ্কার ক'রে গোটা গোটা অক্ষরে লিখতে আরম্ভ ক'রে দিলো। এখন প্রায় এগারোটা বাজে, খাওয়া দাওয়া সেরে এর সঙ্গে চিঠি লিখে বিকেলের মেলএই সে চিঠিটা পোস্ট ক'রে দেবে। হাতের লেখাতে যা দাঁড়িয়েছে, ছাপালে এর চেয়ে অনেক ভালোই দাঁড়িয়ে যাবে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু সে বুঝেছে, এবং বুঝেছে সত্যটাই। কিন্তু শেষ লাইনের আগের লাইনের 'বিহনে' কথাটা বরাবরই তার কানে কেমন যেন কটু, কেমন যেন হ্যাকা আর মেয়েলী ব'লে মনে হ'চ্ছে। কলমের পেছনটা চুষতে চুষতে শকুন্তলা ভাবার চেষ্টা করলো অন্য কোনো কথা দেওয়া যায় কিনা। 'অভাবে' দিলে কেমন হয়? যেমনই হোক্, তাহ'লে কবিতা হয় না। শকুন্তলা শেষের দু'টো লাইন কেটে দিলো, লিখলো—

শুধু তুমি নাই, তাইতো নিদয় অবকাশ
ব্যথিত বাষ্পে ভরিছে আঁখির নীলাকাশ।

পরিষ্কার ক'রে লিখতে গিয়ে, বড়ই আশ্চর্য, আরো কয়েকটা কথা শকুন্তলা বদলে ফেললো। কিন্তু সে সব আমরা আর দেখতে যাব না; তার প্রথম লেখাটাই আমাদের বেশ লেগেছে, সুন্দর লেগেছে। হ্যাঁ সুন্দর লেগেছে; এ ক্ষেত্রে, ভেবে দেখলাম, 'সুন্দর' কথাটি ছাড়া আর কোন সুন্দর কথা প্রযোজ্য নয়। যাক্, কবিতা নিয়ে রাত্তির কাটাতে মন্দ লাগে না, কিন্তু আমাদের এই আখ্যায়িকার চলমান গতি অতি মাত্রায় ব্যাহত হ'চ্ছে।

লেখা শেষ ক'রে শকুন্তলা উঠলো। উঠে সে বাইরে চ'লে গেলো। দেখলো, তার বাবা খাওয়া দাওয়া সেরে মুখ ধুচ্ছেন।

তিনি শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে ব'ললেন, এতো বেলা করলি? বলিনি, সময় মতো খাওয়া সেরে তারপর লেখাপড়া করিস। রোজ রোজ এই অ-নিয়ম, এতো ভালো কথা নয়!

রোজ রোজ অ-নিয়ম! শকুন্তলা হাসলো,—এই অ-নিয়মই তো তাহ'লে তার জীবনে নিয়মে রূপান্তরিত হ'য়েছে। ব'ললো, মেশোমশার কাগজের জন্যে—

—রেখে দে তোর মেশোমশায়! নিখিলবাবু তেতে উঠ্লেন: ও-ও এক পাগলের ডিম। কতদিন আর চালাবে! ইন্সিওরেন্সএর দালালী করছে, এখন এই হুজুগে লোকজনের সঙ্গে চায় চেনাজানা হ'তে! বলিস্ না ওর কথা, ইন্সিওরেন্সের পলিসির কথা ভাবতে ভাবতে ও হ'য়েছে এক পলিসিবাজ! পাঠাস নি লেখা।

মা গায়ে কাপড় দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন: বলি, কার পিণ্ডি চট্‌কাচ্ছো? খেটে যায়, তাই বুঝি চোখ টাটাচ্ছে?

—খেটে? নিখিলবাবু ক্ষেপে গেলেন: কাকে শোনাচ্ছো খাটার কথা, আমি খেটে খাই নি? এখনই না-হয় পেন্‌সন! তোমার ও ভগ্নিপতিটির কথা ব'লো না। ছোটলোক, ছোটলোক! দশটাকা ধার নিলে, আর শোধ দিয়েছে? ব'লো না, হ্যাঃ! নিখিলবাবু হাত মুছতে মুছতে ঘরের দিকে গেলেন।

শকুন্তলা ও-সব কথায় আর কান করলো না। তেলের শিশি, সাবানের কেস, সায়া-সেমিজ-কাপড় কাঁধে ফেলে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো।

বাথরুমের ভেতরের কথা আমরা আর জানতে চাইবো না। এখন আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করি। বাইরে থেকে তোড়ে

জল পড়ার শব্দ আমরা পাচ্ছি। শকুন্তলা এখন কী করছে! কী করছে? ধৈর্য ধরুন! একটু কান পেতে শুনুন না ততক্ষণ ওদিকে কিসের কথা কাটাকাটি আরম্ভ হ'য়েছে!

পুরুষকণ্ঠ : কাগজ! কাগজ! জোচ্চোর কোথাকার, দশ দশটি টাকার আনকোরা নোট! বেমালুম হজম করলে! শুনতে তো কিছু বাকি নেই, রেস্টুরেণ্টে একজনের সঙ্গে ঢুকে গো-গ্রাসে গিলে চুপচাপ বেরিয়ে আসে, দে বেটা পয়সা তুই দে!

বামাকণ্ঠ : এত খবরও আসে তোমার কাছে!

পুরুষকণ্ঠ : আসবে না? দু'দিনের জন্মে এখানে বেড়াতে এসে আমাকে নিয়ে নাস্তানাবুদ। সঙ্গে সঙ্গে বেড়াবে, আর যার সঙ্গে আমি কথা কইবো, ও এগিয়ে গিয়ে তাকেই ব'লবে—ইন্‌সিওর ক'রেছেন? লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না।

বামাকণ্ঠ : না মিশলেই পারো। আমাকে শোনাচ্ছো কেন?

পুরুষকণ্ঠ : বিনপয়সায় লেখা হয় না। আগে টাকা পাঠিয়ে দিক্, তবে শান্ত লেখা দেবে। আলবৎ, ওর সঙ্গে ওই সম্বন্ধ। এই আমি বলে দিচ্ছি এক্ষুণি ওকে—শান্ত—

ভেজা-ভেজা এক রাশ চুল নিয়ে, কোনো রকমে কোমরে কাপড়টা জড়িয়ে শকুন্তলা খুট ক'রে দরজা খুলে অতি হাল্কা পায়ে বেরিয়ে এলো।

নিখিলবাবু ডাকলেন, শান্ত—

—বাবা।

—এদিকে আয়, শোন্, আজই তুই লেখা পাঠা, কিন্তু ভি-পি ক'রে দে।

—সে কি? শকুন্তলা নিখিলবাবুর মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করলো।

—হ্যাঁ, তাই! লেখার দাম আছে! মেহনতের দাম আছে।

—কিন্তু আমার তো পরিশ্রম একটুও হয় না এতে!

—না হোক্, তবু! এ-তো ভালো কথা নয়,—বাহাদুর, তামাক দিয়েছিস্? ওপরে রেখে আয়। সত্যি, এ ভালো কথা নয়, কেন টাকা দেবে না?

নিখিলবাবু ওপরে উঠে গেলেন।

শকুন্তলা হাসছিলো। মা সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে ব'ললেন, দিন দিন মাথা খারাপ হচ্ছে।

খাওয়া দাওয়া সেরে শকুন্তলা এসে আবার তার ঘরে ব'সলো। তার মাথার শিরায় শিরায় দূষিত রক্তের স্রোত ব'য়ে চ'লেছে। আধখানা আধখানা দুশ্চিন্তা জোড়া লাগা লাগা হ'য়েও তফাতে চলে যাচ্ছে। মনে আসছে, একটা ট্রেন ভীষণ জোরে একটা বাঁক নিতেই আকাশে একটা উড়োজাহাজের কাৎ হয়ে গোঁ গোঁ শব্দ; দাউ দাউ ক'রে কোথায় যেন আগুন লেগেছে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশ বন্যায় পরিপ্লাবিত; ছোট একটা বিষধর সাপ, বড়ো একটা হিংস্র শার্দ্দূল; একটা প্রকাণ্ড বাস হুড়হুড় ক'রে আসতে আসতে একটা লোককে চাপা দিতে গিয়েই তার দোতালাটা ভেঙে প'ড়ে গেলো; অনর্গল বর্ষা, বিদ্যুৎ, বাজ! আবার ট্রেন, সবশেষে আবার উড়োজাহাজ।

অবশেষে শকুন্তলা বুঝলো, অনেকক্ষণ থেকে পেন্‌টি প্যাডের কাছে ধ'রে সে ব'সে আছে। ছোট্ট ত॰মাত্র একটা চিঠি, এই সে

এতক্ষণ পর্যন্ত লিখে শেষ করতে পারলো না! এই কিছুক্ষণ আগে সে তার মনকে সান্ত্বনা দিয়েছে, আবার সে সে-সব ভুলে গেল! সংবাদ যখন আসেনি, সংবাদ তখন শুভই। খারাপ সংবাদ তো কাকের মুখে পাখীর মুখে রাষ্ট্র হয়!

সত্যি ব'লতে কি, শকুন্তলা নিজেকে নিয়ে মহা বিব্রত হ'য়ে পড়েছে। দুশ্চিন্তা ভোগ করতেও তার ভালো লাগছে, পরমুহূর্তে নিজেকে সান্ত্বনা দিতেও তার মন্দ লাগছে না। দিলীপ। তিন অক্ষরে তার নাম, কিন্তু তিন সহস্র তার চিন্তা।—অবশ্য তোমার আমার নয়, শকুন্তলার। যে-শকুন্তলা, সোজা বাঙলায় ব'লতে গেলে, দিলীপের প্রেমে প'ড়েছে; সেই দিলীপ, যে-দিলীপ, ন্যাকামীর সুরে ব'লতে গেলে, শকুন্তলার হৃদয় হরণ ক'রেছে। এক কথায়, যারা হৃদয়ে হৃদয়ে বিনিময় ঘটিয়ে দুই তরফাই লাভবানও যতদূর হয়েছে, ক্ষতিবানও হ'য়েছে ততোধিক—অবশ্য আপাততো, কারণ দিলীপ এখন করাচি, শকুন্তলা কার্সিয়াঙ।

শকুন্তলা আবিষ্কার করলো—আবিষ্কার ক'রে সে বিস্মিত হলো—যে, সে বসে আছে নিষ্কর্মার মতো, মেশোমশায়ের ছোট্ট চিঠিটা লিখে সে চারটের আগে ডাকে পাঠাবে কবিতাটি; কিন্তু তা সে এখনো পারলেনা? নাঃ, প্রেম জিনিষটা বড় কুড়ে, ভয়ানক সময় নষ্ট করায়। শকুন্তলা দ্রুত হাতে লিখে গেল। লিখে গেল সে সামান্য কয়েকটি কথা। লেখা শেষ ক'রে খামে পুরলো, খাম জুড়লো, ডাকলো, বাহাদুর!

ডাক দিতেই শকুন্তলার মাথার শিরা কেমন যেন ক'রে উঠলো। বাহাদুর এসে চিঠি নিয়ে গেলো।

শকুন্তলার আর ব'সে থাকতে ইচ্ছে করলোনা, চেয়ারে ব'সেই গা মোড়ামুড়ি দিয়ে নিলো এবং উঠে গিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার যেন মনে হ'লো তার মাথা ধরেছে। ধরবারই কথা, কবিতাটি লিখতে লিখতে তার মাথার অনেকটা ঘীলু খরচ হয়েছে, চোখেরও অনেকটা শক্তি ব্যয় হ'য়েছে।

শকুন্তলা চোখ বুজে শুয়ে থাকতে থাকতে কখন-যে ঘুমিয়ে পড়েছে, তা আমরা তো জানিই না, সে-ও জানেনা। বেলা এগারোটায় ডাক আসে এখানে, আজও সে-ডাকে দিলীপের চিঠি এলোনা। একটি চিঠি, মাত্র একটি চিঠি। শকুন্তলার ঘুম এবার গাঢ় হয়েছে। গাঢ় ঘুমে মানুষ স্বপ্ন দেখেনা। শকুন্তলা তাই পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে; চোখে তার স্বপ্ন নেই, বুকে নেই দিলীপ।

ঘুম ভাঙতে দুপুর বিকাল হ'য়ে গেছে, বিকাল এসে ঠেকেছে গোধূলিতে। শকুন্তলা এবার চোখ খুললো। আচ্ছা, এমন যদি হ'তো, সে এখন পাশে তাকিয়েই দেখতো দিলীপের চিঠি প'ড়ে আছে। কিন্তু দিলীপের কথা ভাবার আগে সে নিজেকে নিয়ে একটু ব্যস্ত হ'লো, উঠে ব'সে নিজেই নিজের নাড়ির গতি অনুভব করতে ব'সে গেলো। যা ভেবেছে, পাল্‌স্ একটু যেন লাফাচ্ছে। জ্বরই হ'লো তাহ'লে। তার ওপর, বুকটাও তার ধড়ফড় করছে। মাটি করলো আর কি। এখন যদি সে ভুগতে বসে তবেই হ'য়েছে তার! যদি, হ'তেও পারে বইকি, যদি এই সামান্য অসুখটাই এমন বিপজ্জনক বাঁক নেয় যে শকুন্তলা ম'রে যাবে। তাহ'লে দিলীপের সঙ্গে তার আর দেখা হবে না জীবনে, এবং তার সাহিত্যিক জীবনের এইখানেই

ইতি! কাগজে কাগজে, অন্তত পক্ষে জানা-শোনা কয়েকটাতে তো নির্ঘাৎ, তার ছবি বেরোবে, লিখবে—বাঙলার তরুণ সাহিত্যিকার মৃত্যু। বহু দূরদেশে ব'সে দিলীপ সে খবর প'ড়ে কি করবে? কাঁদবেনা নিশ্চয়, কারণ সে পুরুষ! —না, শকুন্তলা মারবেনা। সত্যি বলতে ভয় নেই, মৃত্যুকে তার ভয়ানক ভয় করছে এখন।

রাত্রের দিকে শকুন্তলার গা ভ'রে পরিষ্কার জ্বর এসে গেলো, সেই জ্বর পরদিন সকাল পর্যন্ত ছাড়লো না। নিখিলবাবু তো ভেবে সারা, তাঁর একটি মাত্র মেয়েকে নিয়ে তিনি বিব্রত হ'য়ে পড়লেন। কার্সিয়াঙে একটাও এম-বি ডাক্তার নেই, যে কটা আছে সব কটাই এল্-এম্-এফ্; তাদের হাতে রুগী ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ব'সে থাকার মানুষ নিখিলবাবু নন্।

শকুন্তলা একটু কাহিল গলায় ব'ললো, অত ব্যস্ত হবার কী হয়েছে! সবতাতেই বাড়াবাড়ি। এখনি ডাক্তার ডাকতে হবে, তার কী মানে আছে?

নিখিলবাবু ব'ললেন, তুই রুগী, তুই চুপ ক'রে শুয়ে থাক্। আমি তোর বাবা, যা করবার তাই করবো। বারো ঘণ্টার মধ্যে জ্বর ছাড়লো না, এ তো ভালো কথা নয়! আজ আমি দার্জ্জিলিঙ থেকে ডাক্তার আনবো, এক্ষুণি।

শকুন্তলার মাথার কাছে তার মা ব'সে বাতাস করছিলেন, তিনি শকুন্তলার কপালে হাত দিয়ে ব'ললেন, জ্বর এখন হয়ত ছাড়বে।

—বলছি কদিন থেকে, নিখিলবাবু আরম্ভ করলেন: অনিয়ম করিস না। নাঃ, মেশোমশায়ের কাগজের লেখা চাই। এখন আসুক

মেশোমশায়, ঠেলা সামলাক এসে। ব'লতে ব'লতে নিখিলবাবু বেরিয়ে গেলেন।

শকুন্তলা চুপচাপ শুয়ে শুয়ে নানান্ কথা চিন্তা করতে আরম্ভ ক'রে দিলো। করাচি, কলকাতা, দার্জিলিঙ, পাঞ্জাব। আচ্ছা, করাচির চিঠি আসতে কদ্দিন দেরী হয়, এয়ার মেলএ দিলে আসতেই-বা কতদিন সময় লাগার কথা? আজ এগারো দিন হ'লো দিলীপের কোনোই সংবাদ এলো না। শকুন্তলা আজই তাকে একটা চিঠি পোস্ট ক'রে দেবে নাকি?—তার-যে জ্বর হ'য়েছে, এ সংবাদটা শকুন্তলা তাকে দেবে! বাহাদুরটাই-বা গেল কোথায়? শকুন্তলা তাকে ডাকবে নাকি? শিয়রে আবার মা ব'সে আছেন। কেন, শকুন্তলা কি মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে নাকি, মায়ের তার মাথার কাছে চুপচাপ এতক্ষণ ধ'রে ব'সে থাকার মানে কি? শকুন্তলা ডাকলো, বাহাদুর!

মা ব'ললেন, কেন?

—দরকার আছে। একটা এনভেলপ আনাবো। বাহাদুর—

বাহাদুর এসে দাঁড়ালো এবং শকুন্তলাকে একটা খাম দিলো। শকুন্তলা ঠিকানা পড়েই একটু চঞ্চল হ'য়ে পড়লো, অ্যাঁ, অবশেষে? অবশেষে দিলীপের চিঠি? শকুন্তলা উঠে ব'সতে গেলো।

মা ব'ললেন, কার চিঠি? আবার উঠ্‌ছিস্ কেন?

শকুন্তলা শুয়েই রইলো, কিন্তু সে ভয়ানক অস্বস্তি অনুভব করছে, মা এখন এখান থেকে গেলেও তো পারেন! শকুন্তলা একটুখানি তাকালো মায়ের মুখের দিকে।

মা ব'ললেন, চিঠি কার?

শকুন্তলা ব'ললো, আছে একজনের, চিনবে না। একটু চা ক'রে দাও না।

—না, এই জ্বরের ওপর চা খেতে হবে না। মা ভালো হ'য়ে ব'সলেন।

শকুন্তলা একটু হতাশ হ'লো, বললো, তবে একটু গরম জল!

মা ব'ললেন, বাহাদুর, স্টোভটা জ্বাল্। জল চাপা দেখি!

শকুন্তলা মুষড়ে পড়লো। একটু থেমে ব'ললো, তুমিই যাও না বাপু! আমার এতো কি জ্বর হ'য়েছে-যে আমার কাছেই ব'সে থাকতে হবে!

—থাক্‌লামই বা, তোর তাতে এতো আপত্তি কি? আবার বুঝি কোত্থেকে চিঠি এসেছে লেখার জন্যে। লিখে দে, এখন লেখা-টেখা হবেনা। ভালো কথা, দিলীপের চিঠি পাস্‌নি?

—পেয়েছি। শকুন্তলা ব'ললো: তুমি নিজেই একটু জল গরম ক'রে দাও মা!

অবশেষে মা উঠলেন। শকুন্তলা বালিশের তলা থেকে খাম টান দিল। মা একটু দাঁড়িয়ে ব'ললেন, ওই তো স্টোভ জ্ব'লে উঠেছে। বাহাদুর, কেট্‌লিটা বসিয়ে দে! মা দাঁড়িয়েই রইলেন।

ধ্যেৎ, শকুন্তলা পাশ ফিরে শুলো। বাহাদুরের একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে, কতদিন স্টোভ জ্বালাতে গিয়ে তেল তুলে দাউ দাউ ক'রে আগুন বাঁধিয়ে ছাড়ে, আজ এতো তাড়াতাড়ি না জ্বালিয়ে পারলো না। যত সব! শকুন্তলা পাশ ফিরে মার দিকে তাকালো। না, উনি এখন ওই দিকে তাকিয়ে আছেন!

শকুন্তলা চিঠি খুললো। পাতা তিন লেখা, এক সঙ্গে সব পড়তে চেষ্টা ক'রে বুঝলো—সে কিছুই পড়তে পারছে না। সে তখন একটু স্থির হ'লো। ধীরে ধীরে চিঠিটা প'ড়ে গেল! সবটা চিঠির স্থান সঙ্কুলান হবে না আমাদের আখ্যায়িকায়, কিছু কিছু সেইজন্যে উদ্ধৃত হ'লো—

প্রারম্ভে :

ক্ষমাপ্রার্থী আমি। হাঙ্গামার মধ্যে এসে পড়লাম, যে শুধু তুমি কেন, শুধু চিঠি কেন, এমন কি নিজেকে ও সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীটাকে ভুলে ছিলাম। ক্ষমা নিশ্চয় করবে।...

মাঝখানে :

...শুভ সংবাদ আছে। হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই ইটালী যাবো।...

শেষে :

...মানুষের ভাগ্যে কখন কি হয় কে জানে? জীবনেও ভাবিনি, মানে, কখনো কল্পনাও করিনি যে আমার বরাতে সাগরযাত্রা ঘ'টবে। ইটালি যাবার আগে চিঠি পাবে। এব মধ্যে তোমার চিঠি চাই! এয়ার-মেল্‌এ চিঠি দিযো! ভালবাসা নিয়ো! পাহাড়ের, সেই মেঘরাজ্যের সেই স্মৃতি, বুঝলে শকুন্তলা,—যাক্। ইতি—দিলীপেন্দু নন্দী।

চিঠি পড়া সাঙ্গ ক'রে শকুন্তলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলো। এখান থেকে করাচিই দূর, ইটালি যে আরো দূর। ইটালিতে বেশি দিন থাকবে না লিখেছে, মাস ছয় সাতের মধ্যেই সে ফিরে আসবে, খুব বেশি হ'লে এক বছর। এই কয়দিনে সে নাকি খুব কৃতির

দেখিয়েছে, এই কয়দিনের মধ্যে সে প্রায় দেড় ঘণ্টা ফ্লাই করতে সক্ষম হ'য়েছে। সেইটাই তার পক্ষে মস্ত বড়ো সার্টিফিকেট! ইটালিতে যাবার হঠাৎ সুবিধে সেইজন্যেই তার ঘ'টে গেলো নাকি।

কিন্তু শকুন্তলা তো বড় মুস্কিলে পড়লো। তাড়াতাড়ি ক'রে চিঠি লিখতে হবে, কিন্তু এখন সে লেখে কি ক'রে। এখন সে লিখতে পারে, তার নিজের পক্ষে কোনো অসুবিধা নেই; কিন্তু মা তো রি রি ক'রে পড়বেন। বাবাও প্রায় ফিরে এলেন ব'লে।

শকুন্তলা বাহাদুরকে দিয়ে কাগজ-কলম কাছে নিলো, মা জিজ্ঞেস করায় সে ব'ললো, জরুরী একটা চিঠির জবাব দিতে হবে, দিলীপের।

—দু'দিন পরে দিলেই হবে!

—না, হবে না। ইটালি চ'লে যাবে তাহ'লে! শকুন্তলা খুলেমেলেই ব'ললো।

মা চোখ বড় ক'রে বললেন, কোথায় যাবে? ইটালি? কেন?

—দরকার আছে! সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো শকুন্তলা।

দ্রুত, কম্পিত হাতে শকুন্তলা চিঠি লিখতে আরম্ভ করলো। এর মধ্যে বাবা এসে পড়লেই হ'য়েছে আর কি! কত কথা তার লেখার ছিলো, কিছুই হ'লো না! কেবল হ'লো প্রাপ্তি স্বীকার আর আনন্দ প্রকাশ, সঙ্গে সঙ্গে বেদনার একটু ছোঁয়াচ।

তৎক্ষণাৎ শকুন্তলা বাহাদুরকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দিলো। বার বার ক'রে তাকে বুঝিয়ে দিলো, সে যেন নীল কাগজের মধ্যে সাদা লেখাওয়ালা কাগজ সেঁটে দিয়ে পোস্টঅফিসে বুঝিয়ে বলে, উড়ো-জাহাজমে যায়গা, তারপর কত টিকিট লাগে শুনে নিয়ে তবে টিকিট কিনে, জিজ্ঞেস ক'রে পোস্ট করে

বাহাদুর ঘাড় কাৎ করতে করতে বেরিয়ে গেলো।

নিখিলবাবুর গলা পাওয়া যাচ্ছে। মা তো রেগেই আছেন দেরীর জন্যে, ব'ললেন, বাপু, কাকে যেন ডাক্তারি পাশ করিয়ে তবে ধ'রে নিয়ে আসচে। নইলে এত্তো দেরী হয়?

এল-এম-এফ্ ডাক্তারই এলেন। তবে, দার্জিলিঙে নাকি ফোন্ গেছে, বিকেলের দিকে উৎপল মিত্র আসবে। উৎপল ছোকরা হ'লে কী হ'বে, তার নাকি ব্রেণ আছে,—দেখতেও যেমন, শুনতেও তেমন, আবার ডাক্তারিতেও তেমনিই।

নাড়ি ধ'রে, জিভ দেখে বুক দেখে ডাক্তারবাবু উঠে গেলেন। ব'ললেন, কিছু নয়, সামান্য সর্দিজ্বর যাকে বলে। ওষুধ দিযে দিচ্ছি, সেবে যাবে।

সারলেই ভালো। সেরে যাবে, নিখিলবাবু তাই চান্। কিন্তু তাঁর এদের ওপর মোটেই আস্থা নেই। উৎপলের নাম শোনাব পর থেকে, আর একটা হাঁপানি-রুগী ও একটি অ্যাব্সেসের চিকিৎসাব গল্প শুনে উৎপল সম্বন্ধে তাঁব একটু দুর্বলতা এসেছে।

বিকেলে সেই উৎপল এসে হাজির হ'লো। এম-জি গাড়ীখানা নিখিলবাবুর দরজায় দাঁড করিয়ে হর্ণ দিতেই ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে তিনি ছুট্ দিলেন।

শকুন্তলার বড় রাগ হ'চ্ছে। সামান্য এই অসুখে এত হৈ-চৈ করার মানে কী? কপালের ওপর থেকে চুল মাথার ওপর উঠিয়ে, গায়ে ভালো ক'রে চাদরটি জড়িয়ে শকুন্তলা কুঁকড়ে, আড়ষ্ট হ'য়ে শুয়ে রইল।

উৎপল গম্ভীর গলায় কথা বলতে বলতে, পাইপ টান্‌তে টান্‌তে, জুতোর শব্দ করতে করতে ঘরে এসে ঢুকলো। শকুন্তলা আরও জড়োসড়ো হ'য়ে উঠলো যেন।

বাহাদুর তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার টেনে খাটের পাশে রাখলো। উৎপল চেয়ারে ব'সে গলার কাছে টাই একটু ঢিল দেওয়ার মতো ক'রে ব'ললো, কবে জ্বর এসেছে? কাল? বুকেও নাকি একটা পেন্‌ আছে বলছিলেন সকালে। (শকুন্তলাকে) আপনি একটু ঘুরে শোন্‌।

শকুন্তলা পাশ ফিরে শুয়ে উৎপলের মুখে একটুখানি তাকিয়েই চোখ নামালো।

উৎপল ব'ললো, কি কি অসুবিধে বলুন তো খুলে! মাথা ধরে? মাঝে মাঝে? বুক ব্যাথা করে? কি ব'ললেন, ব্যথা নয়? তবে? একটু ধড়ফড়? খুব দুর্বলতা বোধ হয়, না?

উৎপল পাল্‌স্‌ দেখলো। তারপর স্টেথেস্‌কোপ কাণে লাগিয়ে ব'ললো, চিৎ হয়ে শোন্‌। চাদরটা কাইগুলি একটু সরাবেন। আচ্ছা থাক, ওতেই হবে! খুব জোরে নিশ্বাস নিন্‌ তো! ভয় পাচ্ছেন কেন? একটু কাৎ হন্‌। হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখি! বাঃ!

স্টেথেস্‌কোপ খুলতে খুলতে ব'ললো, কয়েকদিন খুব উত্তেজনা গেছে, না? খুব ব্রেণ ওয়ার্ক গেছে নিশ্চয়! মুস্কিল, আপনার আবার লেখিকা, নিষেধও করতে পারি না, শুনবেন না। বলছি, মাস কয়েক কাগজ কলম থেকে অ্যালুফ থাকুন তো! ব্রেণ একটু রেস্ট চায়, আর চিন্তাও করবেন না! আমি বিশেষ কিছু ওষুধ দেবোনা আপাততো, তবে একটা টনিক দিচ্ছি! জ্বর ছাড়বার জন্যে মাত্র তিন ডোজ ওষুধ দেবো। এতেই সেরে উঠবেন।

আমার হাতে উপস্থিত প্যারালিসিসের একটা রুগী আছে, সে-ও ভয়ানক চিন্তা করে। রোগও সেই জন্যে সারাতে পারছি না। —ব'লে সে প্রেস্‌ক্রিপশ্যন লিখে দিলো।

উৎপল চ'লে গেলো। পেছন পেছন নিখিলবাবুও গেলেন। ওষুধ পত্র নিয়ে ফিরে এসে নিখিলবাবু ভয়নক রেগে আরম্ভ করলেন: ডাক্তারি পড়িনি ব'লে কি ডাক্তারি মোটেই জানি না! দেখো তো কেমন চট করে রোগ ধরে গেল! এল-এম্-এফ কোনো কাজের নয়, বলে—সর্দিজ্বর। সর্দির নাম নেই, সর্দিজ্বর। ঠিক, ঐ লিখে লিখে এমন হ'য়েছে, নিশ্চয় লিখে লিখে হ'য়েছে, একশো বার ব'লবো! উৎপল মিত্র চমৎকার ডাক্তার, নাড়ি ধরে আর রোগ বলে।

মা ব'ললেন, আর আকাশে তুলো না! আবার হয়ত একদিন ওরই পিণ্ডি চটকাবে!

নিখিলবাবু ওষুধ ঢালতে ঢালতে ব'ললেন, আকাশে তোলা মানে! সত্যি কথাটা বলবোনা? দেখে নিয়ো আর পাঁচ বছরের মধ্যে ও কি একটা হ'য়ে দাড়ায়। কলকাতায় গিয়ে যদি বসে ও, তবে আরও উন্নতি করতে পারবে! শান্ত, নাও, হাঁ করো তো মা! সে কি? আমি গ্লিস্‌রেস ক'রে নিয়েছি। একেবারে তেতো নয়, কেবল একটু ঝাঁঝ। খাও, একটু মশলা আনবো? আচ্ছা, না আনলাম, খাও!

শান্ত ওষুধ খেয়ে কাৎ হয়ে শুলো। ভয়ানক মুস্কিল হয়েছে তার। নিখিলবাবুর পাগলামীর জ্বালায় সেও প্রায় পাগল হয়ে উঠলো ব'লে! বেশি দিন যদি এমনি ক'রে চলে তবেই হয়েছে আর কি! লেখা পড়া যদি একেবারে বাদ দিতে সে বাধ্য হয়, তবে কি

নিয়ে তার সময় কাটবে? শকুন্তলা কাৎ হ'য়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো। উৎপলের চোখ দু'টো, উঃ, কী চকচকে! গায়েব রঙটাও যেন চকচক করছে, শরীরের রীতিমতো যত্ন করে ব'লতে হবে। সুন্দর মানুষ তো বহু দেখা গিয়েছে, কিন্তু এমন চাকচিক্য আছে ক-জনের? উৎপলের বৌযের কি ভাগ্য!

কিন্তু উৎপল যে আজও বিয়ে করেনি একথা শকুন্তলা জানে না। জানবেই বা কি ক'রে? আজই-না প্রথম এর নাম শুনলো। কিন্তু শকুন্তলা যে লেখে এ-সংবাদ তাকে দিলো কে?

শকুন্তলা ভাবলো, নিশ্চয় তাব বাবা মেয়ের গুণকীর্তন কবেছেন!

উৎপলের উপর যেন একটু বিশ্বাস এসে গেলো। সামান্য কয়েক মুহূর্তের দেখায় সে ব'লে গেলো কিসের থেকে তার এ রোগের উৎপত্তি! কিন্তু সে টের পেলনা, কত সাধরণ কথা ব'লে গেলো উৎপল। যে লেখে তার মাথায় অনবরত একটা ফিলসফি ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াবে, এ তো যে-সে ব'লতে পারতো, অবশ্য একটু সাধরণ জ্ঞানও তার থাকা দরকার। উৎপলের সেটুকু আছে, বেশি কিছু নেই ব'লতেই হবে।

ঘুরে ঘুরে উৎপলের আর আসতে হ'লো না। কিন্তু তাকে আবার আসতে হবে, এটুকু ভবিষ্যৎবাণী অমার পক্ষে করা আশ্চর্য নয়, কারণ আমারি না হাতে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর ক'রে আছে। যখন শকুন্তলা তার পা ভেঙ্গে ফেলবে, তখন উৎপল আবার এখানে করবে পদার্পণ! কিন্তু সে-কথা আসতে এখন একটু দেরী

আছে। কিন্তু এখন উৎপলের আর আসতে হ'চ্ছেনা, শকুন্তলা পরিপূর্ণ রূপে সুস্থ হ'য়েছে এখন!

দিলীপের এখান থেকে যাওয়ার পর এক-এক ক'রে কয়েক মাস গত হ'য়েছে। এখন সে গেছে ইতালি, যে-দেশে রোম নগর; যে নগর, ছেবেলোয় প'ড়েছি, একদিনে তৈরি হয়নি। দিলীপের চিঠি আসছে, শকুন্তলাও এদিক থেকে ক্রমান্বয়ে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শকুন্তলার সমস্ত হৃদয় উপুড় হ'য়ে পড়ে আছে একই পাত্রের ওপর, শকুন্তলা উন্মুখ আগ্রহে চেয়ে আছে সেই একই উদ্দেশে—কবে দিলীপ ফিরে আসবে।

গত পরশু-দিন ইটালী থেকে এক ভয়াবহ সংবাদ এসেছে। সেই থেকে শকুন্তলা মনে আর শান্তি পাচ্ছেনা মোটেই। চার-শো পচাত্তর ফুট কি কম কথা? সেইখান থেকে প্যারাসুট-লাফ দিয়েছে নাকি দিলীপ! কেন, এত দুঃসাহসে দরকার কি? লোক ঝাঁপ না দিলে কি তার আর চলে না? সে কি জানেনা, তার জন্যে শকুন্তলা কত দূর দেশে ব'সে কত অজস্র দুশ্চিন্তায় দিনাতিপাত করছে! সেই আকাশ, ভাবতেই তো শকুন্তলার সমস্ত রক্ত বরফ হ'য়ে যাচ্ছে, সেইখান থেকে প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে পড়ার অর্থ কি। ছিতে বিপরীত ঘ'টতে কতক্ষণ? বিপদের মধ্যে স্বেচ্ছায় কে লাফ দিয়ে পড়তে চায়, বলো! তার ওপর আরো লিখেছে সে—সে নাকি ক্রমশ এই উর্ধ্বতা বাড়িয়ে হাজারে দাঁড় করাবে অচিরেই! অদ্ভুত, অদ্ভুত! অদ্ভুত দিলীপ, অদ্ভুত এই আধুনিক যন্ত্র-যুগ, এই বর্বর সভ্যতা, এই সভ্য বর্বরতা। শকুন্তলার একাল আর যেন ভাল লাগে না সেই সেকালই যেন ছিলো মধুর, নিরাপদ। ক্রস্-কান্ট্রি ফ্লাইট্ শেখা

হ'লেই সে ফিরে আসবে, লিখেছে; কিন্তু সে-ব্যাপারটা শিখতে আর কতদিন তাঁর বাকি? 'বি' ক্লাস্ লাইসেন্সের জন্মে যদি এতো হাঙ্গামা, তবে সাধারণ 'এ' ক্লাস্ই ভালো! নাঃ, এ যুগটি অতি বিশ্রী। মানুষের অল্পে যেন আশ মেটেনা! স্পীড্, স্পীড, স্পীড্! মানুষ স্পীড্ স্পীড্ ক'রে মরলো।

শকুন্তলা উত্তর লিখতে বসে গেলো। প্রথমেই সে লিখলো তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে। সূর্যোদয় পত্রিকায় তার 'পঙ্কিল মোর শঙ্কিল মন' কবিতাটি পড়ে দিলীপ তাকে বাহবা দিয়েছে, শকুন্তলা লিখলো, বাহবা পাওয়ার কৃতিত্ব তার নয়, দিলীপেরই। কারণ এ কবিতার জন্মদান করেছে দিলীপ। শকুন্তলা কে? সে তো মাত্র লিখেই মুক্ত। এবং আরো লিখলো—পত্রিকাটা শকুন্তলা পাঠিয়েছে নিতান্তই মনের খেয়ালে, কেবলমাত্র তার কবিতাটি পড়াবার জন্য নয় (শকুন্তলা এখানে নিজের সাফাই গেয়েছে ব'লতে হবে)। দূর দেশে সে আছে, বাঙলা থেকে একটা চিহ্ন তাকে পাঠিয়েছে কেবলমাত্র একটা আন্তরিক সহানুভূতিতে।

উত্তরে দিলীপ লিখলো: সহানুভূতি জিনিষটা কেবলমাত্র তোমারি নয়, আমারো। তুমি যে বহুদূরে আছো, অবশ্য আমার কাছ থেকে, তোমার আমার মাঝে এই যে দুস্তর ব্যবধান তাতে তুমি যেমন আমার জন্মে, আমিও তেমনি তোমার জন্মে, চিন্তিত। বাস্তবিক, পুরাতন কত জিনিষ আমরা ভুলে গেছি, কিন্তু তোমার স্মৃতি কিছুতেই মুছে যাচ্ছে না। মনে করতে পারো, আমি এখানে আনন্দে আছি! আনন্দেই আছি বটে, কিন্তু, সেই আনন্দের মাঝে কোথায় যেন একটু ঘা আছে! শকুন্তলা, সহানুভূতি আমারও আছে।

কিন্তু দুঃখিত, কবিতা আমি লিখতে পারি না, নইলে আমিও তোমাকে একটা কবিতা লিখে পাঠাতাম। মনে রেখো বলার কথা আমারও আছে অনেক, অনেক—তোমার চেয়ে কম নয়। কবিতার বদলে আমার এই ফটোটি পাঠালাম, প্রাপ্তিস্বীকার ক'রো।

শকুন্তলা ফটোটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। দিলীপের শরীর আরো যেন ভালো হ'য়েছে মনে হচ্ছে তার! শরু গোঁফ রাখতে আবার আরম্ভ ক'রেছে কেন? নাঃ, তারো টেস্ট এমনি ভাবে হঠাৎ বদল হ'য়ে যাচ্ছে? হ'লে হবে কি, গোঁফে সে যেন আরো সুন্দর ফুটেছে! শকুন্তলা অনেকক্ষণ ফোটোটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ অবশ ক'রে ফেললো, তার দৃষ্টি-শক্তি যেন একটু দুর্বল হ'য়ে এলো তার যেন মনে হ'চ্ছে, ফোটোটা এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেনা, ক্রমে ক্রমে কে যেন সেটি তার কাছ থেকে টেনে টেনে, দূরে নিয়ে যাচ্ছে। আবছা হ'য়ে উঠ্ছে দিলীপের ছবিটি!

ওঃ, তাই বলো! শকুন্তলার চোখে জল এসে গেছে। শকুন্তলা টেবিলের ওপর মাথা রাখলো।

অনেকক্ষণ এই অবস্থায় থাকার পর হঠাৎ শকুন্তলা মাথা তুললো। সে যেন কী-একটা পরম লোভনীয় জিনিষ পেয়ে গেছে। ঘন-বর্ষণের পর স্নিগ্ধ আকাশে বৈকালিক ম্লান রোদের মতো ঠাণ্ডা কোমল হাসির রেখা পড়লো তার মুখমণ্ডলের প্রতিটি রেখায়। কী একটা ভীষণ রোমাঞ্চে শকুন্তলা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি কলম কাগজ টেনে-টুনে, দরজা বন্ধ ক'রে সে মগ্ন হ'ল সাধনায়।

আনন্দ, ভয়ানক আনন্দ হ'চ্ছে শকুন্তলার। লিখতে মানুষের এতো আনন্দ হয় স্বয়ং লেখিকা হ'য়েও এ-রহস্য তার কাছে এতোদিন এমন অপরিচিত ছিলো। শকুন্তলা বেশ সান্দ্র হ'য়ে ব'সলো। টেবিলের ওপর উপুড় হ'য়ে প্যাড্‌এর সঙ্গে নাকের ডগা লাগিয়ে, না, এক ইঞ্চি তফাতে রাখলো। উপন্যাস, হ্যাঁ, প্রথম আজ সে উপন্যাসে হাত দেবে। নাঃ, তার চেয়ে সে আগে একটা ছোটো মতো গল্পই লিখে ফেলুক। অনেক দিন না লিখে (উৎপলের উপদেশানুসারে) তার মস্তিষ্কে আর হাতে যেন একটু মরচে প'ড়ে গেছে। তার জীবনই তো মস্ত একটা উপন্যাস, যে কোনো সময় সে তা লিখে ফেলতে পারবে। নিজের জীবন নিয়েই সে না-হয় লিখলো, তাতে তার লেখা যদি Bad Novelsএর দলে পড়ে, তাতে তার আপত্তি নেই। Good Novel ক'জন লিখতে পারে? এমন কি আমাদের বার্ণার্ড-শ এতো বড়ো প্রতিভা নিয়েও নিজের নভেল থেকে নিজে স'রে দাঁড়াতে পারেন নি, তাঁর সম্বন্ধে সবই আমরা তাঁর No-nage Novels থেকে পাই,—এতে তাঁর লেখাগুলো Bad Novelsএর দলভুক্ত হ'য়েছে—শকুন্তলারো না-হয় তাই হ'লো! আর, কোন্ লেখা থেকে তার লেখক নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে? সে যে অসম্ভব, সে যে অবিশ্বাস্য! যাই হোক, শকুন্তলা একটা গল্প লিখবে। এবং আবার মেশোমশার সূর্যোদয় পত্রিকায় পাঠিয়ে দেবে। না হ'লে মেশোমশায় সত্যি দারুণ চ'টবেন।

সমস্ত চেতনা একটি বিন্দুতে সঙ্কুচিত ক'রে, তার প্রতিভার সবটুকু উজ্জ্বলতা উজ্জ্বলতম ক'রে শকুন্তলা লিখলো। গোটা গোটা অক্ষরে, কথার পর কথা বসিয়ে এক ঘণ্টায় সে মোটে আধপাতা লিখতে সক্ষম হ'লো। কিন্তু যেটুকু লিখেছে, আবার সে পড়ে দেখলো—ভারি

মধ্যে দিলীপের কথা যেন অত্যন্ত বেশি বলা হ'য়ে গেছে। দিলীপই তাকে পেয়ে ব'সেছে, না, সেই দিলীপকে পেয়ে ব'সেছে—শকুন্তলা ঠিক ভেবে পেলো না। তবে, এটুকু সে বুঝলো-যে তার দিবারাত্রির প্রত্যেকটি ফাঁক পূর্ণ হয়েছে দিলীপকে দিয়ে।

নাঃ, এখন আর লিখে দরকার নেই। রাত্রের দিকে যখন সকলে ঘুমায় তখন আকাশের তারার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা থাকে জেগে। রাত্রেই সে গল্পটি লিখবে, এখন দিলীপকে একটা চিঠি লিখুক।

শকুন্তলার চিঠির মধ্যে সবার প্রথম প্রশ্ন হ'লো, দিলীপের ইতালীতে আর কতদিন থাকতে হবে? আজ মাস আষ্টেক তো হ'লো তার কার্সিয়াঙ থেকে যাওয়ার পর। ইতালীতে এখন শীত কেমন? কার্সিয়াঙে তো রীতিমতো বরফ পড়ার অবস্থা। কলের জল ঘোলের মত সাদা, অর্থাৎ জমে যেতে যেতেও তরল আছে। শকুন্তলার শারীরিক অবস্থা এতোই হীন যে এবারকার শীত তার কাছে অসহ্য ঠেক্‌ছে। লেখা? দুঃখের কথা দিলীপ আর কেন বলে! লেখা তার মাথায় উঠেছে, লেখার কথা ভাবতে তার ভয় করে। সত্যি, লেখক-জীবনের মতো এমন ভয়াবহ বেঁচে থাকা আর আছে কি? শুধু লেখো, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, স্বাস্থ্য নাই, অর্থ নাই। আছে যশ, আছে নিন্দা। কী ভয়ানক পুরস্কার! এই কঠোর ব্রতের এই সিদ্ধি। শকুন্তলার নাকি হাসি পায়। হাসি পায় কেবল অত্যন্ত কান্না পায় ব'লে। দিলীপের এ বিষয়ে কী মত?

দিলীপ লিখলো: আমার আবার মত! তোমার যাতে কান্না পায় তাতে আমার কি হাসি পাওয়ার কথা, শকুন্তলা? (দিলীপ

এখানে একটুমাত্রায় মেয়ে হ'য়ে প'ড়েছে ব'লে মনে হ'চ্ছে) লেখা যদি তোমার এতো বিস্বাদ লাগে, তবে আমার অনুরোধ, লেখাটেখা ছেড়ে দাও! কি হবে ছাই ভূতের বেগার খেটে? এর চেয়ে ইস্কুল-মাস্টারী-যে ভালো! ভালো পড়াতে পারলে লোকে বাহবাই দেবে। কিন্তু ভালো লিখলেও লোকে একটু বাকা চোখে না তাকিয়ে পারে না। নিরপেক্ষ সমালোচনা ক'জন করে? বড়ই দুঃখের বিষয়, শকুন্তলা, 'সমালোচনা'র আগে আমাকে 'নিরপেক্ষ' কথাটি ব্যবহার করতে হলো। যারা বাংলার ক্রিটিক তাদের বাঙলা নাম থেকে 'সমা'টা তুলে শুধুমাত্র 'লোচক' বলা উচিত। তুমি কি বলো?

—আমি বলি? শকুন্তলা উত্তরে লিখলো: তুমি যা লিখেছ তাই। আশ্চর্য লাগছে বড়ো, তুমি কেমন ক'রে আমাদের সাহিত্যের বাজার চিনলে? কিন্তু যাক্ ওসব অকেজো কথা। আজকালও প্যারাস্যুট-লাফ্ দিচ্ছো নাকি? গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কদ্দুর শেখা হ'লো? কবে আসছো বলো তো? এখনো কি এক বছর?

উত্তরে দিলীপের চিঠি এলো। লিখেছে: বলো কি, এ-ক ব-ছ-র! আরো এক বছর যদি আমাকে থাকতে হয় তবে আমি দম বন্ধ হ'য়েই ম'রে যাবো। তোমাদের ছেড়ে এত দিন যে এত দূরে আছি এই কি যথেষ্ট নয়? প্রায় সাড়ে নয় মাসের ওপর হ'য়ে গেলো। বড়ো জোর আর মাসখানেক এখানে থাকবো, এর মধ্যে সব যদি শেখা হয়, হ'লো। নইলে আর দরকার নেই আমার। দেহের যৌবন এখনো অনেকদিন থাকবে আশাকরি;

কিন্তু মনের যৌবন হঠাৎ যদি ফসকে গেলো তবেই মাটি। তাই আর থাকার ইচ্ছে নেই। তোমার নিশ্চয়ই খুব আনন্দ হবে এ সংবাদ পেয়ে, আমারো যথেষ্ট স্ফূর্তি হ'চ্ছে তোমাকে লিখতে ব'সে। প্যারাস্যুট্-লাফ চ'লছে বই-কি! দিন দিনই মানুষের উন্নতি হয়। আমারো না-হয় হ'লো, তাতে তোমার আপত্তি আছে? কোনো ভয় নেই, অ্যাক্সিডেণ্ট কিছু ঘ'টবেনা। আর যদিই-বা ঘটে তার ওপর কোন আপীল চ'লবেনা। যদি ঘটে, তবে একটা দুঃখ থেকে যাবে, শেষ-মুহূর্তে তোমায় দেখতে পেলাম না। কিন্তু এ-সব কাল্পনিক খেদ। এ-কথা নিয়ে তুমি আবার মাথা ঘামিয়ো না। হার্ট একেই দুবল, আরো দুর্বল হ'য়ে পড়বে তাহ'লে।

শকুন্তলা সত্যি সত্যিই মাথা ঘামাতে আরম্ভ ক'রে দিলো। যে দুশ্চিন্তাকে এতো দিন সে এড়িয়ে এসেছে, নতুন ক'রে আবার সেই দুশ্চিন্তাই তাকে পেয়ে ব'সলো। অযথা যা-তা ভেবে সে নিজের শরীরে স্নায়বিক দুর্বলতা এনে ফেললো। কিছুক্ষণ ব'সে থাকার পর উঠে দাঁড়াতে তার পৃথিবী দুলে ওঠে, কিছুক্ষণের জন্যে সব অন্ধকার দেখায়। এই সব সময় কোন একটা অবলম্বন না পেলে সে নিজেকে সোজা রাখতে পারে না। এমনি মুস্কিল হ'য়েছে তার। সর্বদা তার মাথার মধ্যে একটা এরোপ্লেন ভোঁ ভোঁ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেদিন চুপচাপ শকুন্তলা তার ঘরে ব'সে নানা কথা চিন্তা করছে। হঠাৎ তার কানে সত্যি সত্যি এরোপ্লেনের শব্দ এলো। আসতেই শকুন্তলা শব্দ ক'রে চেয়ার পেছনে সরিয়ে দিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি

জানালার কাছে গেলো। দিলীপ ব'লেছিলো না?—হঠাৎ একদিন এসে পড়তে পারে! সত্যিই আজ সে এলো নাকি? কিন্তু না, শকুন্তলা হতাশ হ'লো—আকাশ একেবারেই ফাঁকা। উড়োজাহাজ তো উড়োজাহাজ, একটা পাখীও নাই। ওঃ হরি! এতক্ষণে শকুন্তলা বুঝলো—পাশের ঘরে বাহাদুর স্টোভ জ্বালিয়েছে। শকুন্তলার এখন দুঃখেও হাসি পেলো। সেই ইতালী থেকে দিলীপ আসবে কি ক'রে? করাচি যাওয়ার সময় না সে ব'লেছিলো—হঠাৎ দেখতেও পাবো উড়োজাহাজে উড়তে উড়তে এসে হাজির হ'য়েছি। করাচি থেকে আসাই মুস্কিল, তা আবার ইতালী! শকুন্তলা আবার এসে ব'সলো। এটা হ'চ্ছে ফাল্গুন, আসতে আসতে তার সেই বৈশাখ।

দিলীপের চিঠি অনেকদিন না পেয়ে শকুন্তলার দিন আজকাল ভালো যাচ্ছে না। হ'য়েছে আর-কি, অঘটন একটা কিছু হ'য়েছেই! না হ'লে এতদিন অনবরত চিঠির আদান-প্রদান হ'তে হ'তে দিলীপ থেমে গেলো কেন? নেহাৎ-ই কিছু ঘ'টেছে! হয়, মেঘ মনে ক'রে পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা, না হ'লে প্যারাসুট উড়িয়ে নিয়ে গেছে এক ভীষণ জঙ্গলে—সেখানে বাঘ-ভাল্লুকও তো আছে। থাক, যা হবার হ'য়েছে, শকুন্তলা ভেবে আর কি করবে?

কিন্তু দিলীপের চিঠি সেই দিনই এলো। করাচি থেকে লিখেছে। লিখেছে: ওপরের ঠিকানা দেখে নিশ্চয় আশ্চর্য লাগছে, গতকাল এখানে এসে পৌঁছেছি বিকেলের দিকে। কেমন মজা বলো তো এবার? দিন দুই এখানে থাকবো। তারপর

দিল্লী হ'য়ে কলকাতা, কলকাতা হ'য়ে কার্সিয়াঙ। ভারি আনন্দ লাগছে আমারো কিন্তু। তোমার বেশি আনন্দ লাগছে, না, আমার লাগছে—এ নিয়ে তর্ক হবে সাক্ষাতে। এতদিনই যদি গেলো, তবে আর দিন দশ নিশ্চয় সহ্য হবে, কি বলো? দিল্লীতে মাত্র একদিন থাকতে হবে, সামান্য একটু কাজ আছে। আজ দুপুরে একটু আরব সাগরের ওপর উড়োজাহাজ চালাবো। দিল্লীতে যাবার আগে আবার চিঠি লিখবো।

চিঠি ধরে শকুন্তলার হাত কাঁপছিলো! একে একে কত আনন্দের কথা আজ তার মনে হ'চ্ছে। সব কথা ভুলে গিয়েও একটি দিনের কথা আজ বার বার মনে না ক'রে সে পারছেনা। আর ক'দিনই-বা? দিলীপ এসে প'ড়লো ব'লে! কয়েক দিন সে দিলীপকে নিয়ে খালি পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াবে। দুপুর, সকাল, সন্ধ্যা, কোনো নিয়ম রাখবেনা। এতদিন দিলীপকে উদ্দেশ ক'রে যা কিছু লিখেছে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে প'ড়ে প'ড়ে সব দিলীপকে শোনাবে। দিলীপ তখন সাগ্রহে তাকে চুমু না খেয়ে পারবেনা। আঃ, কি পরিতৃপ্তি! শকুন্তলার চোখ বুজে এলো।

শকুন্তলা ছুটে বাড়ীর ভেতরে গেলো, ব'ললো, মা, দিলীপ আসছে!

—কৈ? সে কি? কবে? মা গড়াতে গড়াতে চৌকী থেকে নামতে আরম্ভ করলেন।

শকুন্তলা হাসলো, বললো, আসেনি, আসবে। করাচি পর্যন্ত এসেছে। আসচে সপ্তাহে এখানে পৌছবে।

—এরি মধ্যে ফিরে এলো যে?

এরি মধ্যে? শকুন্তলার ভয়ানক রাগ হলো। একটা বছর ঘুরে গেলো, তাতেও মায়ের মন উঠ্‌লো না। কেন, তিনি আরো দীর্ঘদিন প্রার্থনা করেন নাকি? রাগে শকুন্তলার সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে যায়। দিলীপেরই বা কাণ্ডজ্ঞান কেমন? এখন করাচিতে দু'দিন বিশ্রাম না করলে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যায় নাকি? না বাপু, পুরুষ মানুষের মন বোঝা তার মতো মেয়ের সাধ্য নয়। আবার দিল্লী যেতে হবে, যতো সব! কাজের যেন আর অন্তই নেই কারু, এক শকুন্তলাই নিষ্কর্মা। শুধু মায়ের উপর কেন, দিলীপের ওপরও তার ভয়ানক রাগ হ'চ্ছে। একবার আসুক্ না এখানে, শকুন্তলা এর টিট্ তুলবে! হ্যাঁ, ভারী! সে মেয়েমানুষ হ'য়েছে ব'লে যেন চোর হ'য়েছে! আচ্ছা, দিলীপ এখানে এসে পৌঁছলে শকুন্তলা সব-চে প্রথমে তাকে কি কথা ব'লবে! কোন্ শাড়ীখানা প'রে সে তৈরী হ'য়ে ব'সে থাকবে?—আর কোন্ ব্লাউজটা?

দিল্লী থেকে দিলীপের চিঠি এলো: ক্রমশই এগোচ্ছি, হঠাৎ লাফ দিয়ে কার্সিয়াঙে গিয়ে হাজির হবো, একেবারে বিনা নোটিশে। তোমাকে আশ্চর্য ক'রে দিতে আমার ভারী ভালো লাগে। আশ্চর্য হ'য়ে যখন চোখ বড় বড় ক'রে তাকাও, তখন দিলীপেন্দু নন্দী যেন একেবারে ক্ষেপে যায়। সত্যি, তোমার চোখ দুটির মধ্যে কি যেন যাদু আছে, ও চোখে কোনোদিন না জল আসে—কারণ, চোখের জল যে চোখকে কুৎসিত করে, জানো বোধ'য়—আমি সেই চেষ্টাই করবো। ভালো কথা, আবার একটু লক্ষ্ণৌ যেতে হবে এবং আজই যাচ্ছি। এখানকার কাজ হ'য়ে গেছে। লক্ষ্ণৌ থেকে পরশু দুপুরে রওনা হবো, তরশু কলকাতায় পৌঁছবো সকালে। দেশের দিকে ফেরার পথে কত

যে বাধা আসছে তার অন্ত নেই। যাই হোক্, তোমরা আমার কুশল প্রার্থনা ক'রো, তবেই আমি কৃতার্থ। লক্ষ্ণৌ থেকে আর চিঠি পাবে না।

দিল্লী থেকে লক্ষ্ণৌর পথে একটা ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আমরা দিলীপকে বেশ একটু প্রফুল্ল দেখতে পেয়েছি। দেশের পথে কার-না মনে আনন্দ হয়, বলো।

এদিকে, শকুন্তলাও আছে বেশ আনন্দে। তার বুক ধড়ফড়, পেটে একটু ব্যথা, মাথাঘোরা উপসর্গগুলো তাকে একটু নিষ্কৃতি দিয়েছে ব'লে মনে হ'চ্ছে যেন। ঘর-দোর পরিপাটি ক'রে, টেবিল গুছিয়ে, আলমারী সাজিয়ে শকুন্তলা একেবারে তৈরী। যে কোনো মুহূর্তে এখন দিলীপ এসে পড়লেই হয়।

আজ সেই তরশু। শকুন্তলার ঘুম ভাঙতে একটু বেলা হ'লো। এতোক্ষণ দিলীপ নিশ্চয়ি কলকাতায় পৌঁছে গেছে। আজ রাত্রেই নিশ্চয়ি সে মেল্-এ রওনা হবে কার্সিয়াঙ। আগামী কাল সকালে সে এসে পৌঁছে যাবে। উঃ, শকুন্তলার এতো আনন্দ হ'চ্ছে-যে তার বুক কাঁপছে। আগামী কাল যদি একান্তই না আসে তবে পরশু তো নির্ঘাৎ।

পরদিন দিলীপ এলোনা। এতে চিন্তার কি আছে? তবে, শকুন্তলার মনটা যেন কেমন একটু খারাপ লাগছে অকারণেই। তার ওপর খেতে ব'সে তার বাবা গল্প করছিলেন, আজ কাগজে নাকি দিয়েছে পাটনার কয়েক স্টেশন পরে ভক্তিয়ারপুর জংশনের কাছে একটা মালগাড়ীর সঙ্গে পরশু রাত্রে প্রায় দশটার সময় পাঞ্জাব মেলের ধাক্কা লেগে ইঞ্জিন-ড্রাইভার মারা গেছে, আর সম্মুখের বোগিটা

হ'য়েছে চুরমার, চার জন লোক জখম হ'য়েছে গুরুতর। সে বোগিটা নাকি ইণ্টার ক্লাসের।

যতই সুচিন্তা করতে যায়, শকুন্তলা যেন ততই হয় হতাশ। নাঃ, এতো সেণ্টিমেণ্টাল হ'লে পৃথিবীতে বাস করা মুস্কিল। আজের দিনটাও তো যাওয়া-যাওয়া হ'য়েছে। আসছে কাল অবশ্যই দিলীপ আসবে। কাল বিকালে হাতে যাতে কোন কাজ না থাকে শকুন্তলা তেমনি বন্দোবস্ত করলো। সে দিলীপের সঙ্গে দুপুর বেলা সেই যে বেরোবে, রাত্রের আগে আর সে ফিরবে না। তার বুকে আর মুখে অনেক কথা জ'মেছে বলার। যদিও সে জানে—সব কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব হবে না, কারোই হয় না। নাঃ, দিলীপের কিছু হয়নি—শকুন্তলা নিজেকে প্রবোধ দেয়—সে তো আর ইণ্টার ক্লাসে চড়ে না, সে তো বরাবরই সেকেণ্ড ক্লাসে আসা যাওয়া করছে। তার ওপর কন্‌টিনেণ্ট থেকে ফিরে এলো—এখন হয়ত ফার্স্ট ক্লাসেই চলাফেরা আরম্ভ ক'রেছে। শকুন্তলা তার কুশল প্রার্থনা করছে, তার কিছু হ'তেই পারে না।

পরদিন সকালে উঠে শকুন্তলা বাহদুরকে তটস্থ রাখলো। এক মুহূর্ত সে যেন না চোখের আড়াল হয়। আজ ভয়ানক কাজ আছে।

শকুন্তলা পারে না বাপু আর। ছিঃ! টেবিল ক্লথের ওপর কে যেন কালির ছিট দিয়ে গেছে এরি মধ্যে। দিলীপ কী-যে ব'লবে তাকে! সব্বার জ্বালায় ভদ্রলোকের কাছে মুখ দেখানো ভার হচ্ছে তার। আবার বইগুলোকে এলেমেলো ক'রলো কে? যাক্ গে। যা হবার হোক। শকুন্তলা এখন স্টেশনে চ'ললো। এতক্ষণও যখন দিলীপ এসে পৌছয়নি, তখন, মোটরে এলোনা, ট্রেনেই আসবে।

শকুন্তলা স্টেশনে এসে উপস্থিত হ'লো। কিন্তু দিলীপ তো এলোনা। নিশ্চয়ি তার তবে অসুখ বিসুখ কিছু ক'রেছে। আজ তার আসা উচিত ছিলো। সে আশ্চর্য করতে চায় শকুন্তলাকে, হয়ত তবে কাল পরশু হঠাৎ এসে পড়বে! এলেই হ'লো, শকুন্তলা না হয় ইচ্ছে ক'রেই আশ্চর্য হবে। সে আশ্চর্য হ'লে যদি দিলীপেব ভালো লাগে, তবে আশ্চর্য হ'তে তার ক্ষতি কি?

কিন্তু এখন শকুন্তলার বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করলো না। তার কাছে বাসা সঙ্গিহীন প্রবাসের মতো মনে হ'লো। অনেকদিন থেকে সে ঘরে আবদ্ধ আছে, আজ একটু সে ঢালু পথে ঘুরে আসবে ব'লে ছোট ছোট পা ফেলে এগোতে লাগলো। ধুবি-ঝোরা পেরিয়ে শকুন্তলার হঠাৎ কেন যেন কান্না পেলো। তার আর এগোতে ইচ্ছে হ'লো না, পিছোতেও ইচ্ছে হ'লো না। রাস্তার ধারে রেলিঙে ভর দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো।

পাঙ্খাবাড়ির রাস্তা ভাঙা-চোরা, অবশ্য সবটুকু নয়, স্টেশন থেকে নামার পথটুকু। নামতে নামতে শকুন্তলার হঠাৎ একী হ'লো? সে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গেলো।—ভয়ানক ভাবে সে পড়ে গেলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে উঠতে চেষ্টা ক'রে দেখলো তার পা অবশ, পায়ে অসহ্য ব্যথা। মেয়ে মানুষ ব'লে কোনো পুরুষ এগিয়ে এসে ধরতে পারে না, না ধরলেও উপায় নেই। কোন রকমে আলগোছে ধরাধরি ক'রে তাকে বাসায় এনে ফেলা হ'লো। নিখিলবাবু চীৎকার ক'রে উঠলেন: একি? অ্যাঁ! শান্ত, শান্ত। তোর হ'লো কি, মা?

শকুন্তলা অজ্ঞান হ'য়ে যায়নি তবে পা-টা ভেঙে গেছে, নড়ছে! সে তার বাবার মুখের দিকে কাতর চোখে তাকালো। দরজার

কাছে দাঁড়িয়ে মা অকারণে চোখ মুছছেন। শকুন্তলার এতো রাগ ধ'রছে মায়ের রকম দেখে, সে তার পায়ের অসহ্য যন্ত্রণা ভুলেও কাহিল গলায় রেগে উঠলো : কান্নার কি হ'য়েছে, মা ? কাঁদছো কেন ?

বাহাদুর ব'ললো, দিলীপবাবু মর গিয়া !

মর গিয়া। শকুন্তলা উঠে ব'সতে গেলো। মা-বাবার মুখের দিকে তাকালো, তাঁরা স্থির নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শকুন্তলা মনে মনে আর্তনাদ ক'রে উঠলে, ভগবান। এ কথা মিথ্যা করো, নিষ্ফল করো।

জুলিয়েট যেমন নার্সএর মুখে টাইবল্টএর মৃত্যু-সংবাদকে রোমিয়োর ভেবে চীৎকার ক'রে উঠছিলো, শকুন্তলাও তেমনি চেঁচিয়ে উঠলো মনে মনে : O, **break, my heart** ! poor **bankrupt, break at** once ! এবং মনে মনে বললো—এ সংবাদও, ভগবান করুন, মিথ্যা হোক্ ! মিথ্যা হোক্ ! মিথ্যা হোক্ !

শকুন্তলা হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লো। সে কি ? নিখিলবাবু তার মাথায় হাত দিয়ে কাঁপা গলায় ডাকলেন, শান্ত ! শান্ত ! সে কি ? অ্যাঁ, সে কি ?

মা পাশে ব'সে কেঁদে উঠলেন। পাশের বাড়ির সাব-ডেপুটির বৌ কুমড়োর মতো শরীরটা দোলাতে দোলাতে ছুটে এলেন। বাহাদুর কি করবে ভেবে পেলোনা।

—চোখে মুখে জল দাও ! নিখিলবাবু চেঁচাতে আরম্ভ করলেন : ডাক্তার ডাকো ! শান্ত, শান্ত ! বাহাদুর।

বাহাদুর এক বালতি জল দিয়ে ছুটে গেলো ডাক্তারের কাছে। নিখিলবাবু অনবরত চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলেন।

সাব-ডেপুটির বৌ ছানাবড়ার মতো দুটি চোখ পাকিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ছুটতে ছুটতে ডাক্তার বাবু এসে দেখলেন—শকুন্তলা মিটমিট ক'রে তাকাচ্ছে। তার চোখের দৃষ্টি স্তব্ধ।

নিখিলবাবু কাঁপতে কাঁপতে বললেন, পা ভেঙে গেছে ডাক্তার বাবু। একেবারে!

—কৈ, তা তো বল্‌লোনা, বললো অজ্ঞান হ'য়ে গেছে। ডাক্তার বাবু কাছে স'রে এলেন!—হ্যাঁ, তাইতো, এক্ষুণি ব্যাণ্ডেজ করতে হবে। আমি আসছি ঘুরে।

নিখিলবাবুও পেছন পেছন ছুটলেন, উৎপলকে একটা ফোন করতে হবে এক্ষুণি আসার জন্যে।

শকুন্তলা চুপে চুপে জিজ্ঞেস করলো, কে সংবাদ দিলো মা? দিলীপ মারা গেছে?

মা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ব'ললেন, কাগজে বেরিয়েছে।

—কাগজে বেরিয়েছে? কই, দেখি। শকুন্তলা উঠে ব'সতে গেলো: দাওনা কাগজটা!

—পরে দেখিস! পা-টা আগে বাঁধা হোক! মা সস্নেহে ব'ললেন।

—বাঁধতে দেরি আছে, আমার পায়ে যন্ত্রণা নেই, বিশ্বাস করো! বাহাদুর, কাগজটা দেতো! শকুন্তলা অস্পষ্ট গলায় ব'ললো।

সংবাদে লিখেছে—দিলীপেন্দু নন্দী নামক একজন যুবক সেই গাড়িতে ছিল। তার মৃত্যু ঘটেছে। তার দেহ সৎকারের জন্য তার পিতামাতার নিকট সংবাদ গেছে, তাঁরা কলকাতায় থাকেন। বন্ধুর বিবৃতিতে প্রকাশ, দিলীপেন্দু নাকি দ্বিতীয় শ্রেণীতেই আসিতেছিল, তাহার

বন্ধু ছিল ইন্‌টারে! প্রতাপগড় স্টেশনে দুই বন্ধুতে দেখা হয়। দিলীপেন্দু তখন বন্ধুর গাড়িতে উঠিয়া এক সঙ্গেই যাইবে জানায়, কারণ বন্ধুটির সাথে বহু দিন বাদে দেখা। এতে বন্ধুটি তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে সেই গাড়িতে আসিয়া ওঠে। দিলীপেন্দু নাকি বাঙ্কএর উপর শুইয়া শুইয়া বন্ধুটির সঙ্গে গল্প করিতেছিল, হঠাৎ কি হইল বন্ধুটি বুঝিতে পারিল না। কিন্তু যখন বুঝিল তখন দিলীপের মৃত্যু ঘটিয়াছে, সে-কামরার আরো তিনজন তখনই মারা গিয়াছে, কেউ কেউ গুরুতর আহত হইয়াছে। বন্ধুটি এখন হাসপাতালে, তাহার মাথায় খুব আঘাত লাগিয়াছে। জীবনের কোন আশঙ্কা নাই।...

শকুন্তলা আগাগোড়া সম্পূর্ণ সংবাদ প'ড়ে ফেললো।

ডাক্তারবাবু শকুন্তলার পা টিপে ধরলেন, শকুন্তলা ব'ললো, উঃ!

শকুন্তলা আর একটি কথাও বল'লো না। ডাক্তারবাবু ব্যাণ্ডেজ বেঁধে উঠে গেলেন। ব'ললেন, খুব সহ্যগুণ ব'লতে হবে।

নিখিলবাবু ব'ললেন, হুঁ। কোনো আশঙ্কা নেই তো?

—নাঃ, তবে আমার মনে হয় দুটো হাড়ই ভেঙ্গে গেছে। ডাক্তার বাবু একটু ভেবে ব'ললেন, এক্স-রে করানো হয়ত দরকার হবে।

নিখিলবাবু ব'ললেন, তাতে কি? না হয় করাবো!

ঠিক তারপরই উৎপলের মোটর এসে হাজির। নিখিলবাবু বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে এলেন।

উৎপল ব'ললো, কি ব্যাপার?

—প'ড়ে গিয়ে পা ভেঙেছে। একেবারে অজ্ঞান হ'য়ে ম'রে গিয়েছিলো, তারপর জলটল দিয়ে বাঁচাই। তাড়াতাড়ি এখান থেকে এক জনকে ডেকে আনলাম, তিনি পা বেঁধে দিয়ে গেছেন।

—বেঁধে দিয়েছেন, তবে আর কি ?

—না, আমার মশাই বিশ্বাস নেই ও-সব ডাক্তারের ওপর। আপনি রোগী হাতে নিন্, যা করার করুন। যেন খোঁড়া না হয়, আর বেঁচে ওঠে।

উৎপল ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে এলো। শকুন্তলার চোখের কোণ দিয়ে জল পড়ছে। শকুন্তলার সমস্ত শরীর যেন কেমন করছে। শকুন্তলার নিঃশ্বাস নিতে ভয়ানক কষ্ট বোধ হ'চ্ছে। দিলীপ নেই ? সত্যি নেই ? তোমাদের কারো এ কথা বিশ্বাস হ'চ্ছে ? শকুন্তলা তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

উৎপল জিজ্ঞাসা করলো, ব্যথা লাগে ?

শকুন্তলা একটি নিঃশ্বাস ফেলে ব'ললো, লাগে।

নিখিলবাবু ব'ললেন, এক্স-রে করানোর দরকার হবে ?

—কিচ্ছু না ! দরকার হ'লে ক'রে নেবো।

—কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে ?

—কেন, আমার কাছেই আছে সব বন্দোবস্ত, ক'রে নেবো। এঃ, ব্যাণ্ডেজটা একটু ঢিলে হ'য়েছে,—মহিম্ ! ও-গুলো নিয়ে এসো।

মহিম বাক্স নিয়ে এলো।

নিখিলবাবু ব'ললেন, ভাগ্যিস বলেছিলাম পা ভেঙে গেছে, তাই সঙ্গে নিয়ে আসতে পেরেছেন। নইলে মুস্কিল হ'তো তো।

উৎপলের চিকিৎসার আশানুরূপ ফল ফলেছে এবং ফলছেও। এক সপ্তাহের মধ্যেই শকুন্তলা উঠে ব'সতে পারলো। শকুন্তলার ভেতর নিশ্চয়ি একটা চার্ম আছে, নইলে যে তাকে দেখে সেই কেন তার সঙ্গ-লোভে অস্থির হয় ? এই যে উৎপল, যে এক মুহূর্ত্ত

সময় পায় না নিজের কাজ নিয়ে, সে নানাবিধ অজুহাত নিয়ে প্রায়ই এখানে এসে হাজির হ'চ্ছে। সে অজুহাত আর কিছু নয়, উৎপল বলে, পা-টা যাতে না একটু খাটো হ'য়ে যায় এদিকে তার মন দেওয়া বিশেষ দরকার। তাই বলে রোজ ফী নেবে? কি যে বলেন তার ঠিক নেই! এলেই কি টাকা? টাকা নিয়েই কি সম্বন্ধ? উৎপল বড় ঘনিষ্ট হ'চ্ছে মনে হ'চ্ছে।

শকুন্তলার বুকের কোথায় ক্ষত আছে উৎপল জানে না। বলে, আর কিছুদিন বাদেই আপনাকে লেখার অনুমতি দেবো, লিখতে না পেরে বড অসুবিধা হ চ্ছে, না? ইনস্পিরেসন একেবারে মাঠে মারা যাচ্ছে। তা, কি বলে গিযে, আপনি একটা বিয়ে করুন। বেশি দিন অনূঢ়া থাকলে বুকের অসুখ, মাথার রোগ কিছুই সারবে না, বরং বাড়বে।

শকুন্তলা উৎপলকে লুকিযে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করলো। বিয়ে, কাকে সে বিয়ে করবে? দিলীপের অশরীরী আত্মা এখনো যে শকুন্তলার সমস্ত অবসর জুড়ে বিরাজ করছে। শকুন্তলার প্রেম যে কতটা বিষাক্ত সে খবর উৎপল রাখে না। যাকে সে ভালবেসেছে তাকে সে বাঁচিয়ে রাখতে পারে নি। চোখের জলে চোখ কুশ্রী হয়, দিলীপ কুশ্রী চোখ ভালোবাসে না, শকুন্তলা সেইজন্য কান্না দমন ক'রে নিজেকে দিনে দিনে ক্ষয় করছে।

শকুন্তলা একটা নিঃশ্বাস ফেলে ব'ললো, আপনিও একটা বিয়ে করলে পারেন।

—বিয়ে? উৎপল কেস্‌এর ওপর সিগারেটের বাড়ি দিতে দিতে ব'ললে, পারি বটে, কিন্তু উপযুক্ত মেয়ের অভাব।

—কি রকম মেয়ে চান্! শকুন্তলা উৎপলের চোখের দিকে একটু তাকিয়ে নিলো।

উৎপল ঠোঁটের পাশে সিগারেট লাগিয়ে দেশলাই জ্বালতে যাচ্ছিলো, সিগারেট নামিয়ে ব'ললো, যেমন মেয়ে আর কেউ চায় না। ধরুন, অন্ধ খঞ্জ বোবা কালা—যে কোনো এক রকমের। এক কথায় যার খুঁৎ আছে।

শকুন্তলা নিজের পায়ের দিকে একবার তাকালো। তার মুখে কে যেন এক মুঠো সিঁদুর ছুঁড়ে দিয়ে গেলো, আরক্তিম মুখে শকুন্তলা একটু বিব্রত হ'য়ে পড়লো, ব'ললো, চা খাবেন? কোকো?

উৎপল মাথা নীচু ক'রে ব'ললো, বিয়ে করতে তেমন ইচ্ছে করে না। কেন জানেন? যখন ডাক্তারি পাশ ক'রে ডিস্পেন্সরী দেওয়ার টাকার অভাবে দু'বছর দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে দুঃসহ বেকার জীবন বহন ক'রে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ালাম, তখন কোনো বেটা মেয়ে দিতে আসেনি। এখন, ভগবানের কৃপায় একটু দাঁড়িয়েছি। রোজ ঘটক, রোজ মেয়ের বাপ, রোজ চিঠি—জ্বালাতন, জ্বালাতন। বিয়ের এখন কি দরকার বলুন। বেশ সুখে আছি, বিয়ের দরকার ছিল তখন, দরকার ছিল একটি সঙ্গীর, যে তখনকার দিনে সান্ত্বনা দিতো। এখন কী, এখন দুঃখ নাই, সঙ্গী চাই না। এখন সবার টনক ন'ড়েছে। মেয়ে সুখে থাকবে ব'লে আমার দ্বারস্থ হ'চ্ছে সবাই। আমি পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে (উৎপল নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলো) টাকা আনবো, আর তিনি বাক্সে টাকা পুরে পিঠের ওপর চাবি বাজিয়ে বাজিয়ে দোতলা তিনতলা করবেন। স্বার্থপর, দুনিয়াটা স্বার্থপর! দুর্দিনে কোথায় ছিলে তোমরা, আজ আমার সুদিনে

যে পাতা পাড়তে এসেছো? স্বার্থপর! উৎপল মুখে সিগারেট দিয়ে আবার ব'ললো, তবে, যে মেয়ের বিয়ে হ'চ্ছে না, আমি তাকে বিয়ে করবো। ব্যাচিলারত্বর মোহ আমার নেই। চাই বই-কি, সঙ্গী একটা চাই! কিন্তু—

উৎপলের ওপর শকুন্তলার করুণা হল বটে, তবে দিলীপের কথা বার বারই মনে পড়তে লাগলো। দিলীপ ম'রে গেছে, আজো যেন শকুন্তলার বিশ্বাস হয় না। সে যদি স্বচক্ষে তার মৃতদেহ দেখতো—তবু হয়ত সে বিশ্বাস করতে পারতো না।

উৎপল ব'ললো, উঠি আজ, মনের দুঃখে অনেক কথা ব'লে গেলাম, কিছু মনে করবেন না। আর, একটু উঠতে ব'লেছি ব'লে যেন খুব বেশি নড়াচড়া ক'রবেন না। আবার কিন্তু মুস্কিলে পড়তে হবে তাহ'লে।

হুস্ শব্দ ক'রে উৎপলের মোটর ছেড়ে গেলো।

মোটরের শব্দ শুনে নিখিলবাবু ছুটে এলেন, ব'ললেন, উৎপল চলে গেল নাকি? সে কি? এখন যেতে দিলি কেন? তার জন্যে চা, জল-খাবার তৈরী! এ তো ভাল কথা নয়! তাকে যেতে দিলি তুই? ছি ছি ছি! নিখিলবাবু বাইরে বেরিয়ে এসে রাস্তায় উঁকি দিতেই, এই যে, তুমি?

কাবেরী তার কাকার সঙ্গে এসে উপস্থিত।

নিখিলবাবু ব'ললেন, ক'দিন কি হয়েছিলো? একেবারেই আসেন নি?

কাবেরীর কাকা ব'ললেন, মেয়েদের জ্বালায় কি আর আসার উপায় আছে? তারা শুধু এদিক-ওদিক ঘুরতে চায়, কারো বাসায়

যেতে চায় না। একটিকে কোনো রকমে পাকড়াও ক'রে নিয়ে এলাম, আর একটি গেছে সেণ্টমেরীর গির্জায়।

নিখিলবাবু কাবেরীর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে ঘরে নিয়ে এলেন। এখানে কাবেরীর সঙ্গে তাঁর মেয়ে শকুন্তলার সাহিত্য নিয়ে নানা আলোচনা হ'লো। কাবেরী আবার একটু-আধটু কবিতা লেখে, কাবেরীর কাকাই সেটা সহাস্যে প্রকাশ ক'রে দিলেন।

কাবেরী ব'ললে', আপনার অনেক লেখা নানা কাগজে প'ড়েছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার ভাগ্য ঘট্‌বে ভাবিনি। কাকার মুখে আপনার বিষয় অনেক কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছি, কাকা শুধু আপনার ছেলেবেলাকার নানা দুষ্টুমির গল্পই করতেন। কিন্তু কাজের কোনো কথাই তাঁর কাছ থেকে পাইনি। আড়াল থেকে দিদি দিদিই ব'লেছি, কিন্তু আজ প্রথম আপনাকে সম্মুখে পেলাম। (একটু থেমে শকুন্তলার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে) আচ্ছা, অনেকদিন আপনার লেখা পাচ্ছি না কেন? অসুখ ক'রেছিলো বুঝি? এক 'সূর্যোদয়ে' কিছুদিন আগে এই কার্সিয়াঙ নিয়ে, মেঘের এলো-মেলো গান নিয়ে বেশ জমাট এক গল্প প'ড়েছি। আচ্ছা, দীপককে অমন ভাবে মেরে ফেললেন কেন?

শকুন্তলা কাবেরীর এতো কথার উত্তর দিলো না। কাবেরীর সমস্ত কথা শুনবার মতো মনের অবস্থাও তার নয়। তবে, দীপককে কেন মেরে ফেললো, এ-কথাটা তার বুকে আচমকা একটা আঘাত দিয়ে গেলো। মেরে ফেললো কে? সে কি শকুন্তলা? সে তো মেরে ফেলতে চায়নি, সে তো বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেছে, তবে তার সে দুর্বল প্রার্থনা কেউ মঞ্জুর করেনি।

কাবেরী ব'ললো, বড়ই ট্র্যাজিক্ হ'য়েছে। চোখে জল এসে যায়।

শকুন্তলা এতক্ষণে বললো, সত্যি? আমার তাহ'লে লেখার দোষ ব'লতে হবে। কলম সংযত করার মতো শক্তি আমার তা হ'লে নেই। অতটা ট্র্যাজিক্ তো আমি করতে চাইনি। যাক্‌গে, এতক্ষণ তো সুধু আমার কথাই ব'ললেন, নিজের কথা একটু বলুন—কবিতা-টবিটা দু'একটা শোনান্! কবিতা লেখার বড় সখ, কিন্তু পেরে উঠি না।

—কেন, 'সূর্য্যোদয়'এ আপনার একটা চমৎকার কবিতা দেখেছি তো!

—চমৎকার? শকুন্তলা হাসলো: ও চমৎকার নয়, চমৎকার জিনিষটা আরো উঁচু দরের।

কাবেরী ব'ললো, নিজের লেখায় আপনার তবে মন ওঠে না?

—না, সত্যিই না। যে দিন মন উঠবে, সেই দিন থেকে হবে আমার সাহিত্যিক জীবনের অধোগতি। আমার লেখা, সত্যই ব'লছি, আমার ভালো লাগে না।

কাবেরী ব'ললো, আপনার লেখা আমার, সুধু আমার কেন, আমাদের সকলেরই চমৎকার লাগে।

—তা হ'লেই হ'লো। শকুন্তলা স্তিমিত হাসি হাসলো: তবে আমার নিজের ভালো লাগার তো কোনো দরকার দেখিনে!

শকুন্তলা আবার করুণ হাসি হাসলো। দিলীপ তার জীবনকে জ্যোতিহীন ক'রে দিয়ে গেছে। সেই জন্যই বল্‌ছিলাম শকুন্তলার জীবনে একটি ট্র্যাজেডি আছে।

উৎপলের সেবায়-যত্নে শকুন্তলা সুস্থ হ'য়েছে। কাবেরীর অনুযোগ শকুন্তলার মর্মে মর্মে আঘাত দিচ্ছে। সত্যি, অনেকদিন সে সাহিত্য-জীবন থেকে নির্বাসিত এবং সে-নির্বাসন সে গ্রহণ ক'রেছে স্বেচ্ছায়। স্বেচ্ছায়? না, স্বেচ্ছায় নয়। দিলীপ তাকে গ্রহণ করিয়েছে।

দিলীপ শকুন্তলার জীবনের ট্র্যাজেডি। শকুন্তলা খোলা জানালা ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছে, চিন্তা করছে সে অজস্র। আচ্ছা, চিন্তাই কি মানুষের জীবনের প্রধান অবলম্বন? মানুষের জীবনধারণই চিন্তার জন্যে, না, চিন্তাই জীবনধারণের জন্যে? শকুন্তলার কাছে আপাততো শেষোক্তটাই যেন প্রযোজ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য প্রথমোক্তটাও তার জীবনে খাটে।

শকুন্তলার কতো আশা ছিলো, কত ছিলো ভরসা এই দিলীপ। অকস্মাৎ ভগবানের এক মুহূর্তের খেয়ালে তার বর্তমান, তার ভবিষ্যৎ নিমেষের মধ্যে লোপাট হ'য়ে গেলো। সে ভেবেছিলো, দিলীপ বৈমানিক হ'য়ে ফিরে আসার পর শকুন্তলা তার সঙ্গে কত আনন্দে একদিন আকাশবিহারে বেরুবে! আকাশের অনেক উর্ধ্বে উঠে সে দিলীপের সঙ্গে কত কথা ব'লবে। কিন্তু সে সব গেলো কোথায়? যেদিন থেকে সে শুনেছে দিলীপ এভিয়েটর হ'তে দূর দেশে যাবে, সেই দিন থেকেই তার মন যেন তাতে সায় দিতে পারেনি। কেবলই তাঁর মনে হ'তো, এর থেকেই তার আর দিলীপের হবে বিচ্ছেদ। বলা যায় না, কতই তো বিপদ হামেশা ঘটছে। কিন্তু তা তো ঘটলোনা। দিলীপ কত ঝঞ্ঝার সঙ্গে যুদ্ধ করলো, কত প্যারাস্যুট-লাফ দিলো, অবশেষে কিনা ট্রেন?

ট্রেন-দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু ? ঘটনায় যা ঘ'টে গিয়েছে, বেদনায় তাকে বেঁধে রেখে লাভ নেই সত্য, কিন্তু শকুন্তলা এতো শিগ্‌গির কী ক'রে ভুলে যাবে দিলীপকে ? মহাসমুদ্রের দুরন্ত তরঙ্গের সঙ্গে, মহানদের উচ্ছৃঙ্খল স্রোতের সঙ্গে যুঝে এসে কিনা ঘাটের পাষাণে লেগে নৌকা হ'লো চুরমার ! শকুন্তলার কাছে এ সামান্য আক্ষেপের বিষয় নয় নিশ্চয় ।

জানালার কাছ থেকে ফিরে এসে শকুন্তলা সোফার ভেতর ঝুপ ক'রে ব'সে পড়লো। থাক্। শকুন্তলা নিশ্বাস ফেললো। বৃথা তার এ দুশ্চিন্তা। যা হবার তা তো হ'য়ে গেছে, না না, শকুন্তলা ভুল ক'রছে, যা হবার নয় তাই হ'য়েছে। শকুন্তলা একটু স্তব্ধ হ'লো। হলদে রঙের বৈকালিক গোল রোদ্দুর দেয়ালে প'ড়ে আছে। শকুন্তলা সেই দিকে চোখ রাখলো। ক্রমশ সে-রোদ হ'লো গোলাপী, ফিকে গোলাপী, অবশেষে ধূসর, শেষ-বেশ কালো। শকুন্তলা জানালার দিকে তাকালো, ওঃ! সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। আজ থেকে, হ্যাঁ, আজ রাত্রি থেকেই শকুন্তলা উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করবে! সাহিত্যই হোক্ তার জীবনের সান্ত্বনা ।

তৎক্ষণাৎ শকুন্তলাকে আর এক চিন্তা এসে চেপে ধরলো। উৎপলের কথা সে ভাবতে আরম্ভ করলো। উৎপলকে সে স্টাডি করতে চেষ্টা ক'রেছে, পারেনি। উৎপলের মতলবটা কি ? সে কী ব'লতে চায় ? হঠাৎ সেদিন অমন আচমকা বিয়ের কথা তুললো কেন ? তার বিয়ে নিয়ে উৎপলের এতো মাথা ব্যথার কি হ'য়েছে ? সে যদি বিয়ে না-ই করে, যদি কেন, বিয়ে তো সে করবেই না, তাতে উৎপলের কোন ক্ষতি আছে ? নাঃ, উৎপলের মতি-গতি

বিশেষ সুবিধের নয়। তার সঙ্গে বেশি মেশা শকুন্তলার ঠিক হ'চ্ছে না। নিখুঁৎ মেয়ে উৎপল বিয়ে করতে চায়না, তবে কি ইসারায়-ইঙ্গিতে শকুন্তলার দিকেই আঙুল দেখাচ্ছে? শকুন্তার পা ভেঙে গেছে, বুকের অসুখ, মাথার যন্ত্রণা, আবার চোখেরো দরকার হ'চ্ছে চশমার। এইগুলোই কি উৎপলের আকর্ষণ? ভাবতেও শকুন্তলার কান্না পায়। উৎপল তার ক্ষতের মধ্যে কেন এমন ক'রে খোঁচা দেয়? সে অনূঢ়া থাকবে, নিজেকে লুকিয়ে রাখবে নিজের ভেতর। নিজেকে নিয়েই নিজে থাকবে বিব্রত।

বিয়ে? কি ক'রে সে বিয়ে করবে? যাকে বিয়ে করবে তাকে সুধু দেহটি ছেড়ে দিয়ে চোখে ধূলো দেবে কেন? দিলীপ তো তার আন্তরিক যা কিছু সবই হরণ ক'রে সটান্ নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিয়েছে!

সেই রাত্রে সত্যি সত্যই শকুন্তলা উপন্যাসে হাত দিলো। আত্ম-বিশ্বাস তার মোটেই নেই, কেবলি তার মনে হ'চ্ছে—তার এই প্রথম প্রচেষ্টা হয়ত সফল হবে না, হয়ত হবে সে একেবারেই ব্যর্থ। তবু হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে থেকে লাভ নেই, আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে সে-রাত্রে সে পুরোপুরি একটি পাতা লিখে ফেললো। টেকনিকের দিক থেকে, সমালোচকদের মতে, শকুন্তলার ভবিষ্যৎ ভালো। সুধু এইটুকু ভরসা নিয়ে সে আরম্ভ তো করলো, এখন মর্যাদা রাখতে পারলেই হ'লো। প্রত্যেক অক্ষরে সে ভুলে যেতে চেষ্টা করলো-যে সে নিজের জীবন-কথা লিখছে, লেখা থেকে নিজেকে সে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা করলো। হঠাৎ যখন উচ্ছ্বাস এসে পড়ে, শকুন্তলা তৎক্ষণাৎ কাগজ থেকে

কলম তুলে নিয়ে নিজেকে সবল্ করতে আরম্ভ করে। কারণ, সে জানে, দৌর্বল্য থেকেই উচ্ছ্বাসের পরিপুষ্টি।

পরদিন দুপুরবেলা হঠাৎ উৎপল এসে উপস্থিত। শকুন্তলা তখন বাইরের ঘরে ব'সে লিখছিলো, এই সময় সে নায়িকার কাছ থেকে নায়ককে বিদায় দিচ্ছে, হঠাৎ কিনা উৎপলের মোটরের হর্ন! শকুন্তলা তাড়াতাড়ি দেরাজের মধ্যে কাগজ লুকিয়ে ফেলতে গেলো। কিন্তু ততক্ষণে উৎপল দরজায় ধাক্কা দিয়েছে।

শকুন্তলা বললো, খুলছি।

—খুলুন!

শকুন্তলা দরজা খুললো। উৎপল ঘরে ঢুকেই ব'ললো, A lonely life requires a mate, অসময়ে এসে পড়লাম। দার্জিলিঙটা ঘিঞ্জিসহর, কিন্তু একটাও সঙ্গী নেই। কেন বলুন তো?

শকুন্তলার মুখ আরক্ত হ'লো। ব'ললো, তাও আমাকেই ব'লতে হবে?

—নিশ্চয়! আপনারা সাহিত্যিক, সবার মনেরি হালচাল জানেন। উৎপল ভুরু টেনে হেসে ব'ললো।

শকুন্তলা খুট্ ক'রে দেরাজের চাবি ঘুরিয়ে দিলো, ব'ললো, অতটা শক্তি কি আছে?

—আলবৎ আছে, কেন থাকবে না? আপনার একটা ছোট্টো গল্প প'ড়েছিলাম মনে পড়ছে, কোন্ কাগজে মনে নেই যদিও, তাতে আপনি একটি মন-গোমরা মেয়ের মনের কথা এমন স্পষ্ট ক'রে ব'লেছেন, যে আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা একটু উঁচু ধরণের হ'য়ে গেছে। সামনে প্রশংসা আর পেছনে নিন্দা দু'টোই যদিও অমার্জনীয়

অপরাধ, তবু সেইটুকু অপরাধ না ক'রে পারলাম না। পেছনে যদিও নিন্দা করি না। .উৎপল চীৎকার ক'রে হেসে উঠলো।

শকুন্তলা ব'ললো, বসুন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—

—তাতে কি? উৎপল একটু পেছনে তাকিয়ে ধীরে ধীরে সোফার মধ্যে চেপে ব'সে পড়লো, একটু থেমে ব'ললো, ভদ্রতা না করে পারছি না, আপনি লিখছিলেন বুঝি, এসে ভয়ানক ক্ষতি করলাম তা'হলে।

শকুন্তলা ব'ললো, হ্যাঁ, লিখছিলাম বটে, তবে ক্ষতির কী আছে? আজকের দিনই তো লেখার একটিমাত্র দিন নয়! আরো দিন আছে, যতদিন আছে পরমায়ু। শকুন্তলা হাসলো।

উৎপল ব'ললো, কি লিখছিলেন?

—সেই যে বলেছিলাম, সেই উপন্যাসটা। কালো মুখের ওপর শাদা একটু হাসি টেনে শকুন্তলা ব'ললো।

—ভালো! উৎপল একটু পা দোলালো: কবের মধ্যে শেষ হবে আশা করতে পারি? একমাস?—নিশ্চয়। অধৈর্য একটু হ'য়েছি বৈ-কি। শেষ হ'লে যে আপনি আমাকে পড়ে শোনাবেন।

শকুন্তলা বল'লো, প'ড়ে? কেন? যদি একেবারে ছাপা-বাঁধাই বই দি?

—ওঃ, তবে তো সোনায় সোহাগা। প্রকাশক ঠিক হ'য়ে গেছে? উৎপল শকুন্তলার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে ব'ললো।

শকুন্তলা ব'ললো, মোটেই না, তবে লেখা হ'য়ে গেলে একবার কলকাতায় যাবো, তখনি প্রকাশক ঠিক ক'রে আসবো। অবশ্য

চিঠি-পত্র লিখে আগে থেকেই বন্দোবস্তর অর্ধেকটা ক'রে নেওয়ার ইচ্ছে আছে।

—কলকাতা যাবেন, কোথায় উঠবেন? আমাদের বাসায়—

শকুন্তলা ধীরে ধীরে ব'ললো, ওখানে আমার এক মাসীমা থাকেন, সেইখানেই—

—ওঃ, আমি ভেবেছিলাম হোটেল-ফোটেলে বুঝি উঠবেন। আপনার মেশোমশাই করেন কি?

—ইনসিওরেন্স কোম্পানীর অর্গানাইজার, একটা কাগজের পরিচালক।

নিখিলবাবু দরজা দিয়ে উঁকি দিচ্ছিলেন, ঘরে ঢুকে বললেন, চমৎকার। ঠিক এক্ষুণি ভাবছিলাম, তুমি আসবে।

উৎপল পায়ের ওপর থেকে পা নামিয়ে ব'ললো, হ্যাঁ, এসে পড়লাম। অনেক দিন বাদে আজ একটু ছুটি পেয়েছি। এ-কদিন তো প্রাণের ওপর উঠে খাটতে হ'য়েছে। হঠাৎ এতো রোগী এসে পড়েলা হাতে—

শকুন্তলা ব'ললো, প্রায় পনর দিন আসেননি।

—পনর? তা হবে বোধ'য়। উৎপল হিসাব করার ভাণ না ক'রেই ব'ললো।

নিখিলবাবু ব'ললেন, ব'সো। আবার পালিয়ে যেয়োনা যেন, পালাবার অভ্যাস তো আছে। একটু জলযোগ ক'রে, আরে মুস্কিল, কিছু না! সামান্য একটু মুর্গীর মাংস হ'য়েছে, দুটো লুচি ভেজে দিতে কতক্ষণ? ব'সো, সব সময়ই খাবোনা খাবোনা, এ'তো ভালো কথা নয়! ব'সো।

জলযোগান্তে উৎপল উঠলো। না, আর দেরী করা তার পক্ষে অসম্ভব। দার্জিলিঙ পৌঁছতে পৌঁছতেই রাত্তির বেজে যাবে। সেই প্যারালিসিস্‌এর রুগীটার কাছে আজ একবারো যেতে পারেনি, রাত্রে একবার সেখানে তার যেতেই হবে। আর যাওয়া বললেই তো যাওয়া নয়। গেলে দুটি ঘণ্টার ধাক্কা। রুগীর সঙ্গে কথা ব'লে ব'লে তাকে সে সুস্থ করার চেষ্টা করে। Cure by Suggestion ব'লে একটা রীতি আছে এ অসুখের, উৎপল উপস্থিত সেই পথ অবলম্বন ক'রেছে। যে রকম রুগী সে হাতে পেয়েছিলো, এখন তো তাকে তার চেয়ে অনেক সুস্থ ক'রেছে, এখন দেখা যাক্ !

উৎপলের বিদায় গ্রহণের পর শকুন্তলা দেরাজ থেকে আসন্ন বিরহ বেদনায় ব্যথিত দুটি নায়ক নায়িকাকে টেনে বের করলো।

শকুন্তলা পড়লো :—

মিহির অনসূয়াকে ব'লছে, যদি আমি ফিরে না আসি।

অনসূয়া ভারি দু'টো চোখে মিহিরের মুখের দিকে তাকালো, ব'ললো, কেন আসবে না? প্রেম লোভাতুর আমি, আমি তোমায় টেনে আনবো।

পেছন থেকে একটা মোটর আসছিলে,মিহির অনসূয়াকে আকর্ষণ করলো। তাকে চুমো খেতে গেলো, কিন্তু বিবেকের নিষেধে মুখ নিলো সরিয়ে। ঠিক সেই সময় আকাশের ভেতর দিয়ে একটা উড়োজাহাজ উড়ে গেলো।

মিহির ব'ললো, ভ্যাগিস্ ! নির্জন রাস্তা পেয়ে তোমার মুখচুম্বন করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু করিনি ভাগ্যিস। তাহলে ওপর থেকে ওরা তো দেখে ফেলতো।

—হাতি। অনসূয়া ব'ললো, হাতি! ওরা যেন আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে।

মিহির একটু স্তব্ধ থেকে অনসূয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ক্রমশঃই তার মুখের কাছে তার মুখ নিয়ে যেতে—

শকুন্তলার এই পর্যন্ত লেখা ছিলো। কলম ধ'রে একটু ব'সে সে আবার আরম্ভ করলো। আজ রাত্রের মধ্যে সে দুটো অধ্যায় শেষ করবেই। পঁচিশটি পরিচ্ছেদে তার এ গ্রন্থ শেষ হবে, শকুন্তলা আশা করে।

কিন্তু মাস দেড়েক পরে যখন শকুন্তলার লেখা শেষ হ'য়ে গেলো, তখন সে দেখলো, সে লিখেছে মাত্র পনরটি দীর্ঘ অধ্যায়। আগাগোডা বার দুই প'ড়ে দেখলো, ছাঁটকাট ও অদলবদল দরকার। আর দিন দশ খাটলেই সে সব সমাধা করে ফেলবে, কিন্তু এখন প্রকাশক?

দুপুর বেলা ব'সে ব'সে শকুন্তলা কয়েকটি চিঠি লিখলো। কপিরাইট সে বিক্রি করবে না, তবে রয়ালটি-বেসিস্‌এ যদি কেউ রাজি থাকে, তবে তাকে জানাতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন তাদের টার্মস্ জানায়। ন্যায্য বোধ হ'লে শকুন্তলা তক্ষুনি রাজি হ'য়ে যাবে।

মাস তিনেক গত হ'য়েছে দিলীপের মৃত্যুর পর। অনেকদিন পরে শকুন্তলার আজ আবার দিলীপের কথা মনে পডছে। এতো দিন সে যদিও দিলীপকে নিয়েই লিখেছে, তবু তাতে শাস্তি ছাড়া কোনো আঘাত পায়নি। কিন্তু হাতের কাজ ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দিলীপ তাকে পেয়ে বসলো।

কয়েকদিন পরে একটি প্রকাশক-অফিস্ থেকে তার নামে চিঠি এলো। তারা রাজি আছে, তবে এক্ষুনি তারা বই চায়। অর্থাৎ ফেরৎ ডাকে সে যেন তার লেখার বাণ্ডিল পাঠিয়ে বাধিত করে, কারণ পূজোর আগেই তারা বই বের করতে চায়, পূজোর বাজারটা তারা ছেড়ে দিতে রাজি নয় নাকি।

শকুন্তলা একটু ভাবিত হ'লো। লেখার তো নকল নেই তার বিশ্বাস ক'রে সে পাঠিয়ে দেবে, কিন্তু যদি মারা যায়। শকুন্তলা কিছুই ঠিক করতে পারলো না। তার আর কোনো বিষয়ে অমত নেই, প্রকাশক সে মনোনীত ক'রেছে মনে মনে, কিন্তু—

কিন্তু আর কি, শকুন্তলা ভালো হ'য়ে ব'সলো। আজ সন্ধ্যের গাড়ীতেই সে কলকাতায় চ'লে যাক্ না স্বয়ং। সব বন্দোবস্ত নিজেই ক'রে আসুক্। হ্যাঁ, ঠিক! এ বুদ্ধি মন্দ নয়। তবে এতো তাড়াতাড়ি গেলে প্রকাশকেরা তার গরজ বুঝে ফেলবে। কয়েকদিন পরেই না-হয় সে যাবে। না, আজই সে যাবে, আজ সন্ধ্যার গাড়ীতেই! কিন্তু প্রকাশকদের লিখে দিলো, কয়েকদিন পরে সে কলকাতা যাচ্ছে সেখানে গিয়েই সব বন্দোবস্ত করবে। এবং মেশোমশার বাসার ঠিকানা দিয়ে, সেইখানে এক সপ্তাহ বাদে তার সঙ্গে দেখা করতে লিখে দিলো।

নিখিলবাবুকে এ-সংবাদ দেওয়ায় তিনি আনন্দে আত্মহারা হ'লেন, কিন্তু এই অসুস্থ শরীর নিয়ে শকুন্তলাকে একা যেতে দিতে রাজি হলেন না।

শকুন্তলা বললো, শরীর তো আমার একেবারেই সেরে গেছে, বাবা। একা যেতে পারবো না কেন?

—না, না। একা একা যাওয়া যে ভাল কথা নয়। আমি নিজে মত দিতে পারবো না, ফোন্‌এ উৎপলের মত্‌ নি আগে। নিখিলবাবু গম্ভীর হ'য়ে ব'ললেন।

—আবার উৎপলবাবু কেন? শকুন্তলা অধীর গলায় ব'ললো।

মা ব'ললেন, ওর শরীর কি ওর থেকে উৎপল বেশি বোঝে?

নিখিলবাবু তেতে ব'ললেন, না, তুমি বেশি বোঝ! যেতে হয় যাক্‌, আমি নিষেধ করবোনা, তবে সাবধানের মার নেই! বলো তো, আমি না-হয় যাই সঙ্গে। তবে, ওই মেশোমশায় চলবে না, আমার সঙ্গে গেলে সোজা হোটেলে উঠ্‌তে হবে।

শকুন্তলা একটু দাঁড়ালো। বললো, তোমার গিয়ে কী দরকার? ভার-চে—

নিখিলবাবু রাজি হ'তে বাধ্য হ'লেন। কিন্তু সেই সন্ধ্যাতে শকুন্তলার যাওয়া হ'লোনা। ঠিক হ'লো, আগামী মেল্‌এ সে যাবে। এতে শকুন্তলার রাজি না হওয়ার কোনো কথা নেই। ভালোই হ'লো, আজ রাত্রে সে উপন্যাসটা আগাগোড়া আর একবার দেখে নিতে পারবে।

পরদিন দুপুরে শকুন্তলা একটি সুটকেশ আর ছোট্টো একটি হোল্‌ডল্‌এ বিছানা ও বালিশ এবং টুকিটাকি জিনিষ নিয়ে নিখিলবাবুর সঙ্গে স্টেশনে এসে হাজির হ'লো। বহুদিন আগে, কতদিন তা শকুন্তলা ভুলে যেতে চেষ্টা করুক্‌, এমনিই সে এসেছিলো এখানে দিলীপকে তুলে দেওয়ার জন্যে,—কিন্তু ফিরিয়ে আনার জন্যে তাকে আর আসতে হ'লোনা—আস্‌তে হ'য়েছিলো, কিন্তু ফিরিয়ে নিতে হয়নি।

নিখিলবাবুর শুভাশীষ মাথায় বহন ক'রে শকুন্তলা ব'সলো গাড়ীতে। নিখিলবাবু ব'ললেন, বার্থ রিজার্ভ করা তো হ'লনা।

—না হোক, কোন অসুবিধে হবে না।

শিলিগুড়িতে এসে শকুন্তলা একটু বিপদেই পড়লো। দ্বিতীয় শ্রেণীর সব কয়টা কামরা প্রায় ভর্তি। একটা-তে তো এক অ্যাংলো-পরিবার উঠে কিলকিল খিলখিল করছে। কুলীর সঙ্গে সঙ্গে যেতে যেতে শকুন্তলা ছোট্টো একটি কামরা পেলো। ও-দিকের জানলায় ব'সে একটি মেম-সাহেব সিগারেট টানছে। এদিকে একটি সাহেবী পোষাকধারী পুরুষ, বাঙ্গালী ব'লেই তো মনে হ'চ্ছে—যা থাকে বরাতে, শকুন্তলা এইটেতেই বসে পড়লো।

ভদ্রলোকটি পায়ের উপর পা তুলে হেলান দিয়ে ব'সে একটা ইংরাজি ম্যাগাজিন্ পড়ছিলেন। শকুন্তলাকে উঠ্‌তে দেখেই পা নামিয়ে একটু ছোট হয়ে ব'সে জায়গা প্রশস্ত ক'রে দিলেন।

শকুন্তলা জিনিষপত্র তুলে নিয়ে কুলীর পয়সা মিটিয়ে দিয়ে চুপচাপ ব'সলো। মেমসাহেবটি তার মুখের দিকে তাকাচ্ছে, আর পরম তৃপ্তির সঙ্গে সিগারেট টানছে। ভদ্রলোকটিও মাঝে মাঝে শকুন্তলার দিকে তাকাচ্ছেন বই কি। কিন্তু আমরা এখন সেদিকে না তাকালাম। শকুন্তলা চুপচাপ অবলম্বনহীন হ'য়ে খালি হাতে ব'সে থাকতে পারলোনা। সে স্যুটকেশ খুলে কতকগুলো মাসিকপত্র টেনে বার করলো।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। তিনটি যাত্রী এ-গাড়ীতে, কেউই কারো সঙ্গে কথা বলে না। শকুন্তলা তার নিজেরি লেখা কতকগুলো পুরোণো গল্প উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলো।

গাড়ি জলপাইগুড়ি পার হ'য়ে চ'লেছে।

ভদ্রলোকটি অনেকক্ষণ থেকেই নিসপিস করছিলেন, এতক্ষণে শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে বললেন, If you don't mind, আপনি যাবেন কদ্দুর ?

শকুন্তলা মাসিকপত্রটি চোখ থেকে নামিয়ে, গলার স্বর একটু মোলায়েম ক'রে বললেন, কলকাতা।

একটু থেমে শকুন্তলা ব'ললো, আর আপনি ?

—আমি ? ভদ্রলোকটি একটু ভালো হ'য়ে ব'সে ব'ললেন: আমিও কলকাতায়ই। আপনি এই শিলিগুড়িতেই থাকেন বোধ'য় ?

—না, আমি কার্সিযাঙে থাকি। শকুন্তলা আবার প্রতিপ্রশ্ন করলে: আপনি বুঝি শিলিগুড়িতে থাকেন।

—না, আমি কালিম্পং থেকে আসছি। হ্যাঁ, এই বেড়াতেও গিয়েছিলাম, আবার অকটু কাজও ছিলো।

—যদি না কিছু মনে করেন, ভদ্রলোকটি একটু পরে আরম্ভ করলেন: আপনি কি করেন ? কলকাতায় কোনো ইস্কুলে মিসট্রেস্ নাকি ?

শকুন্তলা কুণ্ঠিত গলায় ব'ললো, না মিসট্রেস্ নই। একটু-আধটু লিখি।

—লেখেন ? আব একটু অভদ্রতা তা'হলে না ক'রে পারছি না, আপনার নাম—

শকুন্তলা কাঁধের উপর কাপড়টা ভালো ক'রে দিয়ে একটু আড়ষ্ট গলায় বললো, শকুন্তলা সরকার।

ভদ্রলোকটির মুখে একচাপ বিস্ময় নেমে এলো, চোখ দুটিকে অতিমাত্রায় অস্বাভাবিক ক'রে, সোজা হ'য়ে ব'সে বললেন—আপনি? শকুন্তলা সরকার? So glad to meet you!

শকুন্তলা আত্মপ্রসাদ যতটা লাভ করলো, তার চেয়ে বেশি হ'লো সঙ্কুচিত। আর কোনো উত্তরই সে দিতে পারলো না।

—আপনার লেখা আমি কিছু কিছু প'ড়েছি, ভদ্রলোকটি ব'লতে আরম্ভ করলেন: কিন্তু নাম শুনেছি বেশি আমার বোনের কাছ থেকে। সে-ও আবার একটু-আধটু লেখে কি না! কিন্তু গল্প সে লিখতে চেষ্টা করে, পারে না। লেখে শুধু কবিতা।

—তার নাম কি? শকুন্তলা অবশেষে জিজ্ঞেস করলো।

—তরলিকা সোম। শুনেছেন নিশ্চয়ি তার নাম!

শকুন্তলা শোনেনি, ব'ললো, হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। বই-টই আছে তাঁর?

—হ্যাঁ, একটা ছেপেছে কিছুদিন হ'লো, কি বলে গিয়ে, হ্যাঁ, তার নাম দিয়েছে 'চলিত চম্পক'। আচ্ছা, আমার বোনও এ অনুযোগ করে, আমারো মনে হয়—আপনি বই বের করছেন না কেন? ভদ্রলোকটি সহৃদয় সুরে শকুন্তলাকে ব'ললেন: আপনি তো এ যুগের মহিলাসাহিত্যিকের অগ্রণী। বই বের করুন।

—করবো ইচ্ছে আছে। শকুন্তলা আস্তে আস্তে ব'ললো, পুজোর মধ্যেই একটা বেরোবে হয়ত।

—Is it? বেশ, বেরোক। পড়ে দেখা যাবে। তরলিকাকে আপনার গল্প করবো। সব ব'লবো, উঃ, তার কি আনন্দ হবে যে বলবার নয়!

শকুন্তলা ব'ললো, আপনারা বুঝি কলকাতাতেই থাকেন?

—না, বাইরে। আমরা হচ্ছি প্রবাসী। আর বলেন কেন! আপনি কবে কার্সিয়াঙ ফিরছেন?

—এই, দিন দশ পর।

কলকাতা নেমে তারা ছাড়াছাড়ি হ'লো, শকুন্তলা আর ভদ্রলোকটি। ওয়্যাঃ। শকুন্তলা তো খুব ভুল ক'রে ফেলেছে, ভদ্রলোকটির নাম জিজ্ঞাসা করেনি। নাম বা ঠিকানা। এমন চমৎকার ভদ্রলোক, আলাপ করতে আনন্দ লাগে। মুখের ওপর প্রজ্ঞার একটা গভীর আভাস আছে। নাঃ, খুব ভুল ক'রেছে শকুন্তলা। এতো বেশি মাত্রায় সে আত্মপ্রিয় হ'য়েছে-যে অন্যের কথা তার মনে থাকে না। খুব অন্যায় হ'য়েছে তার, খুব অন্যায় হ'য়েছে! ভদ্রলোকটি কী-যে ভাবলেন তাকে। তরলিকা সোম, তরলিকা সোম, চলিত-চম্পক। শকুন্তলা মনে মনে আওড়ালো, যাতে না ভুলে যায়।

কলকাতায় কিছু দিন কাটানোর পর সে ফিরে এলো কার্সিয়াঙে। সব বন্দোবস্তই সে ক'রে এসেছে, আর তাকে ভাবতে হবে না। পুজোর দিন-পনর আগেই তার বই বেরিয়ে যাবে। মেশোমশার ওপর সে সব ভার দিয়ে এসেছে, কেবল ফাইনাল প্রুফ্‌টা তার কাছে আসবে। যাক্, একটা বই বের ক'রে অথার হ'য়ে থাকা মন্দ না।

আবার দিলীপ। শকুন্তলা বড় মুস্কিলেই প'ড়েছে! নাঃ, তার আর বরদাস্ত হয় না এ ভীষণ যন্ত্রণা। রাত্রে স্বপ্নের মাঝে দিলীপ তাকে ভয়ানক বিব্রত ক'রছে। জেগে বসে থেকেও তার

নিস্তার নাই। প্রতিটি মুহূর্তে দিলীপ! মাস চারেক গত হয়েছে দিলীপের মৃত্যুর পর। এতো দিনেও বিস্মৃতি একটা ভারি যবনিকা ফেলে দিলো না।

তার বাবা-মা দিলীপকে যত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছে, সে যদি অত সহসা তাকে ভুলে যেতে পারতো তবে হয়ত সে নিজেকে সৌভাগ্যবতী ব'লে ভেবে নিতে পারতো। কিন্তু শকুন্তলা এ ও ভেবে দেখেছে, ভুলে যেতে পারলে সে লাভবান হ'তো না কখনই।

দিনের পর দিন শকুন্তলা এমনি ভাবেই তার পরমায়ু গুণ্‌ছে। সেদিন আবার তার বাবার কাছে শুনেছে কাবেরীর দিদি করতোয়া নাকি এই প্রেম ব্যাপার নিয়ে মস্ত এক কেলেঙ্কারি ক'রেছে। সে-সব কথা নাকি অনেক দিন চাপা রাখার চেষ্টা ক'রেছিলেন করতোয়ার কাকা, কিন্তু চাপা কি আর থাকে? নিখিলবাবুর কানে কি না যায়!

এই সব মেয়েদের জবাই করতে ইচ্ছে করে শকুন্তলার। এর নাম তো প্রেম নয়, এ হ'লো ঘোর কামনা, কদর্য হীনতা।

গত রাত্র থেকে ভয়ানক বৃষ্টি হ'চ্ছে। ভাদ্রের মাঝামাঝি সময় কার্সিয়াঙে এমন শীত অনেক দিনের মধ্যে পড়েনি। তার ওপর রাজ্যের মেঘ এসে জড়ো হয়েছে, তাতে শীতটা ধারালো না হ'য়ে হ'য়েছে একটু সাঁৎসেঁতে! শকুন্তলার ইচ্ছে করছিলো, আলমারী থেকে হীটার নামিয়ে প্লাগে লাগিয়ে দেয়। কিন্তু আবার অত হাঙ্গামা করতে তার ইচ্ছে হ'লো না। কিন্তু শীতও তার করছে ভয়ানক। জানলা দিয়ে ঝিরঝির ঝিরঝির ক'রে মেঘ ঢুকছে ঘরে। শকুন্তলা জানলা বন্ধ ক'রে দিলো। ডাকলো, বাহাদুর!

—জীউ! বাহাদুর এলো।

শকুন্তলা ব'ললো, বড় শীত করছে, একটু চা খাওয়া তো!—ব'লে শকুন্তলা উঠে ভেতরে গেলো। ওঃ, গ্র্যাণ্ড! বাহাদুর বুঝি এতোক্ষণ এই আগুন পোয়াচ্ছিলো! শকুন্তলা ছোট টুলটি টেনে নিয়ে আগুন পোয়াতে ব'সে গেলো। বাঃ, আগুনের আঁচটা তো মন্দ লাগছে না। শকুন্তলা চুপচাপ ব'সে রইলো।

একটু পরে বাহাদুর তার হাতে একটা খাম দিয়ে গেলো। শকুন্তলা ওপরের ঠিকানা পড়লো আগে, তাতে শুধু তার নাম ও কার্সিয়াং লেখা। শকুন্তলা চিঠি খুললো, একি? একি বিশ্রী? তার কাছে এ বিশ্রী চিঠি কেন? ভালোবাসা জানিয়ে তাকে চিঠি? শকুন্তলার রাগ হ'লো। হাতের মুঠোয় চিঠি পাকিয়ে সে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলো। ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হ'লো—কে লিখেছে, কোত্থেকে লিখেছে, কিছুই তো দেখা হ'লো না। তাড়াতাড়ি তুলতে যাবে, কিন্তু ততক্ষণ চিঠিটা জ্ব'লে উঠেছে।

খামের ওপর পোস্টাফিসের ছাপ দেখার চেষ্টা করলো, পারলো না। তাও অস্পষ্ট। নাঃ, শকুন্তলা এক এক সময় এমন এক একটা কাণ্ড ক'রে বসে যার মাথামুণ্ডু নাই! খুব ভালো ক'রে ছাপটি সে দেখতে চেষ্টা করলো। ঘরটা যেন অন্ধকার, আলো জ্বাললো। হ্যাঁ, একটু একটু সে বুঝতে পারছে। ছাপটি আছে পার্বতীপুরের। হ্যাঁ, পার্বতীপুরই যেন। কে লিখলো তাকে পার্বতীপুর থেকে? কই, পার্বতীপুরের কারো সঙ্গে তো তার চেনা-জানা নেই। যাক্‌গে, বাজে জিনিষ ভেবে ভেবে সময় নষ্ট করার কোনো মানে নেই! ততক্ষণ ভগবান যে ভগবান, তাকে ভাবলেও কিছুটা লাভ আছে।

শকুন্তলা ভাববে না ভেবেও না ভেবে পারলো না। কে তাকে এমন ভাবে প্রেম-পত্র দিলো? আবার লিখেছে, উত্তর আশা করি। যদিও, উত্তর না পেলে ব্যথিত হবো না। জানি, হঠাৎ কেউ ভালোবাসি ব'ললেই তাতে সাড়া দিতে নেই।

ছিঃ, ভাগ্যিস্ আর কারো হাতে পড়েনি, কী যে মনে করতো তা'হলে। তার কি এতোই অধঃপতন ঘ'টেছে যে সে যেখানে সেখানে প্রেম ক'রে ক'রে বেড়াবে? তার নিজের কাছেই-বা তা'হলে সে কি ব'লে জবাব দেবে? এই সেদিন দিলীপ মারা গেলো, এরি মধ্যে দিলীপের স্মৃতির পর্দা ছিঁড়ে সে বাইরে বেরিয়ে আসবে? এরি মধ্যে ব'লে কি কথা? কোনো দিনই কি সে তা পারবে? সে নিজে তো এ-কথা বিশ্বাস করে না, এখন সাধারণে যদি বিশ্বাস করে, তার ওপর তার হাত নেই।

কী হীন! কী হীন এই পুরুষ মানুষরা। জানা নাই, শোনা নাই, পরিচয় নাই, আছে শুধু প্রেম-পত্র। এ তো প্রেম নয়, এ অশ্লীলতা। এ পশুতা।

একটু পরে বাহাদুর শকুন্তলাকে চা দিয়ে গেলো। হোক্ দুপুর এগারোটা, এখন সে চা-ই খাবে, খাওয়া দাওয়া করতে বাজুক তার দু'টো। কি হবে তার নিয়ম বেঁধে চলাফেরা ক'রে? মুখের কাছে কাপ তুলে শকুন্তলা আবার ব'সলো চুপচাপ। আশ্চর্য, তাকে এ চিঠি দিলো কে? পার্বতীপুরে কে আছে? এখান থেকে পার্বতীপুর বেশি দূরে নয় সত্যি, এই তো শিলিগুড়ির কয়েকটা রেল-স্টেশন পরে। সেখানকার কারো সঙ্গেই তো তার কোনোদিন পরিচয় হয়নি, ঘনিষ্ঠতার কথা সে না-হয় বাদই দিলো। যাক্,

আর সে এ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। শকুন্তলা ধীরে ধীরে চা খেয়ে নিলো।

পরদিন একগোছা প্রুফ এসে পড়লো। ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা দেখে উৎফুল্ল হবার দিন তার কেটে গেছে, তবু শকুন্তলার একটু আনন্দ হ'লো বই কি। মিহির আর অনসূয়া। আচ্ছা, অনসূয়া নামটা সে ব'দলে দেবে নাকি? লোকে তা না হ'লে তাকে ঠাট্টা করতে পারে। শকুন্তলার নায়িকার নাম অনসূয়া হওয়াটা পাঠকের কাছে হাস্যকর হবে না তো? হোক্ গে। শকুন্তলা কাটলো না, আগাগোড়া প্রুফ দেখে সে তৃপ্ত হ'লো, ছাপাভুল প্রায় নেই ব'ললেই হয়। যা বা আছে তা ধর্তব্য নয়, তবু শকুন্তলা কেটে শুদ্ধ ক'রে দিলো। এবং বিকালের ডাকেই দিলো কলকাতা পাঠিয়ে। সব সুদ্ধ বই তার চৌদ্দ সাড়ে-চৌদ্দ ফর্মা হবে, তার তিন ফর্মা সে আজ দেখে পাঠিয়ে দিলো। বড় জোর আর এক মাসের মধ্যে তার বই বেরিয়ে যাবে। কভারের জন্যে অতি আধুনিক রুচি সম্মত একটা ডিজাইন দরকার, তা মেশোমশাই তাঁর পত্রিকার আর্টিস্টকে দিয়ে করিয়ে দেবেন ব'লেছেন। শকুন্তলা মেশোমশাইকে মনে মনে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলো না।

কিন্তু কী আশ্চর্য। অনেকদিন থেকেই শকুন্তলা ভাবছে, তার কাছে আর প্রুফ আসচে না কেন? কিন্তু আজ সশরীরে আনকোরা টাটকা একখানা 'অবধারিত' ডাকযোগে তার কাছে এসে হাজির হ'লো। শকুন্তলা তাড়াতাড়ি খুললো। উঃ, কি চমৎকার ছাপা! তার নামটা বেশ সুন্দর ছাপা হ'য়েছে কিন্তু। সত্যি, মেশোমশায় টাইপগুলো বেশ পছন্দ ক'রেছেন। আর ব্লক? ওঃ, চমৎকার।

বইয়ের মধ্যে মেশোমশায় একটা চিঠি দিয়েছেন। লিখেছেন পছন্দ হ'লো কি না জানাতে। তাঁর মতে গ্রেট্‌-আপ্‌ হাই ক্লাসের হ'য়েছে। আজই তিনি কয়েকটা পত্রিকায় সমালোচনার জন্তে পাঠাচ্ছেন কয়েকটা কপি। প্রকাশকদের মুখ চেয়ে ব'সে থাকলে চলবে না নাকি, নিজের কাজ নিজেরি করা কর্তব্য। আর আসচে কাল তরুণদের কাণ্ডারী অধ্যাপক চক্রবর্তীর কাছে এক কপি পাঠিয়ে দেবেন সমালোচনার জন্ত। শকুন্তলার কিচ্ছু ভাবতে হবে না, নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমাতে পারে ইত্যাদি।

নিখিলবাবু সমাচার শুনে আনন্দিত হ'লেন, এবং ব'ললেন, পাঠাবে না! আলবৎ পাঠাবে। তার স্বার্থ নেই এতে! 'সূর্যোদয়ে'র জন্তে এবার লেখার তাগাদা দেবে। হুঁ হুঁ, বড় ঘুঘু লোক ও, তোমরা ত চিনলে না।

মা ব'ললেন, বাব্বা, আড়াই টাকা দাম করল।

—ক'রবে না? নিখিলবাবু সগর্বে ব'ললেন: বইয়ের দাম নেই? একি তালতলার উপন্যাস? হুহু ক'রে কাটবে এ বই! শান্ত আমার বেঁচে থাক্‌! দে তো আমাকে বইটা, আমি বাজারের দিকেই যাচ্ছি, সবাইকে দেখিয়ে আসি, সব্বার আগে এল্‌-এম্‌-এফ্‌ ডাক্তারটাকে! উৎপলকে আনিয়েছি ব'লে সে দিন আমার মুখের ওপর লম্বা লম্বা কথা বলছিলো। দে!

—আর কেলেঙ্কারি ক'রো না বাবা তুমি! অসহায় কণ্ঠে বললো কুন্তলা।

নিখিলবাবু দৃঢ় চোখে তাকালেন: কেলেঙ্কারি? এতে কেলেঙ্কারির কি আছে? এতোটুকু মেয়ে বই লিখতে পারে এ ধারণা তাদের

আছে? টুকু নয় তো কি? একুশ না মোটে চ'লছে। ব'লবো, চোখের সামে বই ধ'রে ব'লবো—দেখুন মশাই, শুধু গল্পই নয়, বইও সে লিখতে পারে। দে, শান্ত, দে বইটা আমাকে!

শকুন্তলা কিছুতেই দিলো না, তার ওপর মা-ও তার পক্ষ সমর্থন ক'রে নিখিলবাবুর ওপর তোম্বি চালালেন, তাতে নিখিলবাবু রেগে দোতলায় উঠে গেলেন।

দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে শকুন্তলা বইটা পড়লো আগাগোড়া। চমৎকার লিখেছে তো সে! সন্ধ্যের অন্ধকারে ব'সে সে ভাবতে লাগলো, মিহিরকে নৌকাডুবিতে মেরে ফেলার জায়গায় অতি ঘন হ'য়েছিলো নিশ্চয় তার মনোযোগিতা, বইয়ের সেই জায়গাটি বেশ উৎরেছে।

উৎপল বহুদিন থেকে আসছে না কেন? মাঝে একদিন মাত্র এসে শকুন্তলার বই বেরোচ্ছে শুনে আনন্দ প্রকাশ ক'রে সে চ'লে গেছে, তারপর তার আর পাত্তা নেই। আবার বুঝি রোগীর ভিড়ে সে বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছে। এখন একবার এলেও তো পারে, 'অবধারিত'-খানা একবার দেখে যাবে না?

পুজোর আর বেশি দেরি নেই। মাত্র কয়েকখানা বড়ো বড়ো কাগজ ছাড়া শকুন্তলা পুজোর সময় আর কোনো কাগজে লেখা পাঠাতে পারেনি। ছোটো ছোটো কাগজের সম্পাদকদের জরুরী চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও সে চুপচাপ ব'সে রইলো। গত পুজোয় শকুন্তলা মোটেই লিখতে পারেনি, এবার তবু একটু লিখলো। এবার দিলীপ তাকে সম্পূর্ণ অবকাশ দিয়ে গেছে। তাকে নিয়ে আর দুশ্চিন্তা নেই, কেবল আছে একটু ব্যথিত অস্বস্তি।

শকুন্তলার ইচ্ছা ছিলো, পূজোর মধ্যে সে প্লেন-এ নামবে। পূজোর আনন্দটুকু সে না-হয় কলকাতাতেই ক'রে আসবে, কিন্তু তার কেন যেন কার্সিয়াঙ ছাড়তে ইচ্ছে করলো না আদৌ। কয়েকটা পত্রিকা তার কাছে এসেছে, কোনোটায় কোনোটায় আছে তার লেখা, কোনোটায় সমালোচনা। আশ্চর্য, প্রত্যেকটা কাগজ তার বইএর যথেষ্ট প্রশংসা ক'রেছে। কিন্তু শকুন্তলা জানে না যে প্রথম গ্রন্থে বেশির ভাগ লেখকই প্রশংসা অর্জন করে, কিন্তু তার দ্বিতীয় গ্রন্থ আর ততটা প্রশংসা পায় না। যাই হোক্, শকুন্তলা নিজের লেখা এবং নিজের সমালোচনা প'ড়েই সময় কাটাতে আরম্ভ করলো।

কয়েকদিন আগে উৎপল এসেছিলো। এসে শকুন্তলার বই দেখে গেছে, এবং প্রতিশ্রুতি নিয়ে গেছে, কলকাতা থেকে আরো বই এসে প'ড়লেই সে একখানা চায়! (একটু হেসে) আর যদি শকুন্তলা বলে, তবে সে এক কপি কিনেও নিতে পারে বই-কি!

পূজো কেটে গেলো। শকুন্তলার কাছে সেদিন একখানা চিঠি এলো। শকুন্তলা সেখানা তাড়াতাড়ি খুললো। এ যে তার বইএর সমালোচনা! এ কে ভদ্রলোক? ছাপানো প্যাড্। তার ডান দিকে The University, Andhra লেখা, বাঁ-দিকে Apurba-krishna Shome! এ অপূর্ব আবার কে? মেশোমশায় বুঝি এঁকেও এক কপি পাঠিয়েছেন তা'হলে। শকুন্তলা পড়লো, লিখেছেন :

"অবধারিত" প'ড়লুম। যখন তোমার মুখ থেকে শুনেছিলাম বই বেরোচ্ছে তখন বই সম্বন্ধে যতটা ধরণা ছিলো, তার চেয়ে ধারণা হ'লো আরো উঁচু। মিহিরের আর অনসূয়ার চরিত্র

অতি সুন্দর ফুটেছে, তবে নিবারণবাবু লোকটিকে অত হীন করা হয়ত স্তায়সঙ্গত হয়নি। মিহিরের ঝড় মাথায় ক'রে নৌযাত্রা, সে দৃশ্যে তোমার কবি-চিত্তের উজ্জল আভাষ পেয়েছি। (শকুন্তলা কিন্তু আশ্চর্য হ'চ্ছে, সে ভেবে পাচ্ছে না এ সমালোচক কে)। কিন্তু তুমি বড়ো নিষ্ঠুর, অমন সচ্ছল মিহিরকে মেরে ফেলে তোমার লাভ হ'লো কি? সে বেঁচে থাকলে অনসূয়ার চরিত্র-চিত্র কি অস্পষ্ট হ'তো? আমার তা মনে হয় না কিন্তু। তোমার লেখা বড্ড মিষ্টি, এতো মিষ্টি যে অতিরিক্ত মিষ্টি। তোমার ভাষা ও বলার ভঙ্গী তুমি মিষ্টত্ব দিয়ে সুপার-স্যাচুরেট ক'রেছো, ক'রে ভুল ক'রেছো। অত মিষ্টি হ'লে গলার কাছে একটু তেঁতো লাগে। কিন্তু আর একটা জিনিষ আমার আরো ভালো লেগেছে,—তোমার লেখার ব্যাকগ্রাউণ্ডে তুমি মেলাঙ্কলি টিউনে একটা কনসার্ট দিয়েছো। আবার ভুল ক'রেছো কোথায় জানো, সেই কনসার্টটি মাঝে মাঝে স্টেজের ওপর টেনে এনেছো। যদি না আনতে তা'হলে আরো ভালো হ'তো! আমি সমালোচক নই, শুধু ছেলেদের পড়িয়ে আর তাদের ভুল ধ'রে ধ'রে, ভুল ধরার একটা বদ্-অভ্যাস হ'য়ে গেছে; কিছু মনে ক'রো না!

এবার বলো তো আমি কে? চিনতে পারছো না? অমন হাঁ ক'রে তাকাচ্ছো? সেই শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা এক সঙ্গে এলাম মনে নেই? আমি তরলিকা সোমের দাদা। চিনতে পারছো? (শকুন্তলা নিঃশ্বাস ফেললো)।

হয়ত তুমি আমার ওপর চ'টবে। শুধু চ'টবে কেন, চ'টেই আছো! মানুষের মুড কখন কেমন থাকে বলা কঠিন। আমি

কিছুদিন আগে পার্বতীপুরম্ থেকে তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছি, পেয়েছ নিশ্চয়। আমি কিন্তু এবার তোমার চিঠি পাওয়ার সম্পূর্ণ আশা রাখবো। যদি উত্তর না দাও, তবে দুঃখিত হবো নিশ্চয়ি বুঝতে পারছো।

তোমাকে 'তুমি' সম্বোধন ক'রেছি ভুল ক'রে নয়, ইচ্ছে ক'রেই। রাগ ক'রলে কি ক'রবো বলো, স্বভাবই যে আমার অমনি! ভালোবাসা গ্রহণ ক'রো। উত্তর দিয়ো! ইতি—

শকুন্তলা নিশ্বাস ফেললো, এই? কিন্তু আর সে কিছুই ভাবতে পারলো না। বিছানায় শুয়ে প'ড়লো। অপূর্ব তার কাছে থেকে কী চায়? পার্বতীপুরম্, তবে পার্বতীপুর নয়।

তার প্রেমপত্রের খামটি শকুন্তলা সযত্নে তুলে রেখেছিলো। খামের ওপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে দেখলো, হ্যাঁ, ঠিক, পার্বতীপুরম্ শীল আছে। গাড়ীতে ব'সে এঁর সঙ্গে শকুন্তলার ভাব হ'য়েছিলো, 'চলিত-চম্পকে'র কবি তরলিকার দাদা ইনি। ভালো। হঠাৎ এঁকেও যে কবিতায় পেয়ে ব'সলো! প্রফেসারি করছেন, করুন। আবার প্রেম কেন? তা আবার এতো মেয়ে থাকতে শকুন্তলাকে নিয়ে কেন। বুদ্ধিমান লোক তিনি, তাঁর এ মতিভ্রম হওয়ার কারণ কি?

শকুন্তলা এমন ভাবে চিন্তা করছে, আপনারা লক্ষ্য করছেন নিশ্চয়ি, যেন বোকা ছাড়া কেউ প্রেম করে না। অর্থাৎ যে প্রেম করে, তার যেন বুদ্ধির দিক থেকে দোষ আছে। কিন্তু শকুন্তলা পাগল! একদা সে-ও প্রেম ক'রেছে, তার দুঃসহ জের এখনো তাকে টেনে চ'লতে হচ্ছে। তখন, তার সেই প্রেমময় পৃথিবীতে, সে নিশ্চয়ি নিজেকে বুদ্ধিমতী ব'লে চালিয়ে দিয়েছে। শুধু চালিয়েই দেয়নি,

সত্যি তখন বুদ্ধির দিক থেকে তার কোনো অনটনই ছিলো না। নিজের কাছে তো নয়ই, আপনার আমার কাছেও নয়।

দিলীপ! দিলীপ! দিলীপ! তিনবার শকুন্তলা দিলীপের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করলো। দিলীপকে সে জীবনে ভুলে যাবে না, ভুলে যেতে পারবে না,—কেমন ক'রেই বা ভুলবে? দিলীপ তো তার জীবনে গোটা গোটা হরফে লেখা হ'য়ে থাকলো। তার 'অবধারিত'-র প্রতিটি ছত্রে তো দিলীপ সশরীরে জীবিত হ'য়ে রইলো। যতদিন সে জীবিত থাকবে, শুধু সে কেন, যতদিন সাহিত্য জীবিত থাকবে, ততদিন দিলীপ মুছে যাবে না। সাশ্রুচোখে, কম্পিত অধরোষ্ঠে শকুন্তলা মিনতি ক'রে দিলীপের দয়া ভিক্ষা করছে, সে অনুমতি দিক্, শুধু আজের জন্যে, আগামী দিনের জন্যে অগ্রিম যাচ্ঞা তার নেই, শুধু আজের জন্যে সে অনুমতি দিক অপূর্বকে একটি প্রত্যুত্তর দেবার।

শকুন্তলা ধীরে ধীরে লিখলো 'প্রিয়বরেষু,' কেটে দিলো। লিখলো 'মান্যবরেষু,' উপযুক্ত সম্বোধন হ'লো না। ধীরে ধীরে তা-ও দিলো কেটে। পরম শ্রদ্ধাভাজন? নাঃ, সে কি হয়? অনেকক্ষণ চিন্তার পর কিছু ঠিক করতে না পেরে, নিজের ওপরই ভয়ানক চ'টে গেলো, এবং মরিয়া হ'য়ে লিখলো :

প্রিয় অপূর্ব বাবু,

অপ্রত্যাশিত, পরম অপ্রত্যাশিত আপনার চিঠি, এই সমালোচনা! আপনার প্রথম চিঠিখানা আমার হস্তগত হওয়ার পর ভয়ানক চ'টেছিলাম, অবশ্য কে লিখেছে তা জানতে না পেরে। কিন্তু সে-রাগ আমার গেছে। আমার বই আপনি কোথায় পছন্দ

ক'রেছেন কোথায় করেন নি, জেনে বড়ই সম্প্রীতি লাভ ক'রেছি! আমার হাত অতিরিক্ত মিষ্টি, এ অনুযোগ আমাকে একাধিকবার একাধিক সমালোচকের কাছে শুনতে হ'য়েছে। কিন্তু একটু জল মিশিয়ে নি কি ক'রে, জানালে সুখী হবো। আমার লেখার পেছনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা বেহালা করুণ সুরে ছড় টেনে গেছে, হুবহু এই কথাই অধ্যাপক চক্রবর্তী লিখেছেন 'পরিচয়' পত্রিকায়। বেহালাটার তার ছিঁড়ে ফেলা যায় না? অথবা ছড়টা ভাঙা? নইলে ও-যে কিছুতেই থামতে চায় না! কি করি বলুন তো?

—কি করবে? অন্ধ্র থেকে অপূর্ব লিখলো : বড় মুস্কিলের কথা এটা। তোমার জীবনে নিশ্চয়ি একটা ট্র্যাজেডি আছে।

সেকি! অপূর্ব কি ক'রে জানলো? সেকি তবে তার লেখায় নিজেকে সংযত ক'রতে পারেনি? তাহ'লে এ-যে তার লেখার মস্ত বড় দোষ! নিজের জীবনের কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে ঘটনা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে লিখতে নেই! আগে গা-সওয়া ক'রে নিয়ে তবেই লেখা উচিত। শকুন্তলা জেনে পাঠালো অপূর্ব এ আবিষ্কার করলো কী করে? তার জীবনে তো কোনো ট্র্যাজেডি নেই!

—নেই? সে কি? আমার তো বিশ্বাস হয় না। ফেরৎ ডাকে অপূর্ব লিখে পাঠালো, আমার চোখে ধুলো দিতে চেষ্টা ক'রো না, শকুন্তলা! সাইকিক্যাল্ অ্যানালিসিস্ জীবনে অনেক ক'রেছি! প্রথম যে দিন ট্রেনে তোমাকে দেখলুম, সেই দিনই আঁচ করলুম, তোমার আড়ালে নিশ্চয়ি কোনো ট্র্যাজেডি আছে।

এ অবধারিত সত্য। দেখো কাণ্ড, তোমার উপন্যাসের নামটি ব্যবহার করতে হ'লো দেখছি! যাই হোক, যদি সত্যিই কিছু না থাকে তবে জানবো এতদিন যে লেখা পড়ার বড়াই করেছি, সব মিথ্যা। ট্র্যাজেডি মানে যে শুধু প্রেম সংক্রান্ত, তা নয়। ধরো, তোমার বাবা, তোমার মা কিংবা তোমারি কোনো বন্ধু মারা গেছে কিংবা তোমাকে কোনো প্রকারে আঘাত দিয়েছে।

—তাই বলুন। সে রকম ট্র্যাজেডি নেই কে ব'ললো? কিন্তু কি ক'রে ধ'রলেন বলুন তো? শকুন্তলা লিখে পাঠালো।

—তবে? এতো ভুল হবার নয়! অনেক দূর থেকে অপূর্বর চিঠি এলো : সেই ট্রেনে, মাস তিনেক হ'তে চললো, নয়?—সেই ট্রেনে তোমার অতি বিষণ্ণ মুখের ওপর কারুণ্যের একটা অস্বাভাবিক ছাপ দেখে হঠাৎ, অতি হঠাৎ আমি তোমাকে ভালেবেসে ফেললুম। অন্যায় করেছি?

—অন্যায়, কি যে বলেন! যার নাই মাথা, নাই মুণ্ডু। জড়িত হাতে শকুন্তলা লিখতে আরম্ভ করলো : ভালোবাসাতে অন্যায় কোথায় জানিনা। যে-সে কি ভালোবাসতে পারে? নিজেই ভেবে দেখুন না! লোকে বলে, যারা ভালোবাসে তাদের মন অতি নরম। আমি তো বলি, মন দৃঢ় না হ'লে ভালোবাসা মুস্কিল। আপনি কি বলেন?

—ঠিক তাই! একটা কথা, ক্রিসট্‌মাসএ কলকাতা যাবো। মাসটা আবার পউষ পড়ে গেল। যাগ গে। মনের মিলই আসল কথা, সংস্কার মেনে আর চলা যায় না। কি বলো? আমি কলকাতায় তোমাকে আশা করি? একেবারে হাওড়া স্টেশনে, সেখান থেকে

সটান্ হোটেল। আর চিঠি লিখে হাত ব্যথা করা যায় না, একটু সামনাসামনি ব'সে কথা বলার ভয়ানক লোভ হ'চ্ছে। আর 'আপনি' যদি লিখবে, তবে তোমার সঙ্গে আর কথা বলবো না! মনে থাকে যেন! আজ শনিবার, আসচে বিষ্যুদবার আমি কলকাতা যাবো, তুমিও নেমে আসচো তো?

—বেশ, তুমি। তুমি তুমি। হ'লো তো? শকুন্তলা মনে মনে হাসতে হাসতে লিখলো: আমিও কালই রওনা হবো। কার্সিয়াঙের ঠিকানায় আর চিঠি দিয়ো না। বুঝলে? ভালোবাসা জেনো। ইতি, —পুঃ, ম্যাজেস্টিক্ হোটেলেই বন্দোবস্ত হবে।

বাহাদুরকে দিয়ে চিঠি ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে শকুন্তলা নির্বাক ব'সে রইলো। একটু পরে ভেতর গিয়ে এ-ঘর ও-ঘর খুঁজলো, নিখিলবাবুকে পেলো না। তা'হলে ওপরে আছেন। কাঠের সিঁড়িতে লপেটার ফট ফট শব্দ করতে করতে শকুন্তলা ওপরে উঠে গেলো।

নিখিলবাবু শীতে জড়োসড়ো হয়ে সর্বাঙ্গে র‍্যাগ জড়িয়ে চুরুট টানছিলেন। শকুন্তলা ভূমিকা না করেই ব'ললো, বাবা, কাল কলকাতা যাবো।

—হঠাৎ?

—হ্যাঁ, বড্ড শীত প'ড়েছে! অনেকদিন যাইনি! এখানেও একা একা ভাল্ লাগে না! শকুন্তলা হীটারের হাঁ-মুখের দিকে এগিয়ে গেলো।

নিখিলবাবু একটু ভেবে ব'ললেন, তা-তে আমার আপত্তি কি? যা! তোর মেশোমশার ওখানেই তো উঠবি?

সমাচার শুনে মা বললেন, এখন গিয়ে দরকার নেই। কয়েক-দিন পরে তো আমরাও যাবো! সাভোই মাঘ অন্নপূর্ণার বিয়ে। এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে। তোর ছোট মাসিমাও ভুয়ে ভুয়ে যেতে লিখছে। একটি মাত্র মেয়ের বিয়ে, যেতেই হয়! তুই তো আর বিয়ে করবি না, তাদের নিমন্ত্রণ করার ভাগ্যিও আমাদের হবে না। থাক চিরজীবন আইবুড়ো।

—বেশ! শকুন্তলার বুক কেঁপে উঠ্‌লো, ব'ললো, বেশ করবো, আমি বাপু অতদিন দেরী করতে পারবো না তোমাদের জন্যে, আমি কালকেই চলে যাবো!

অনেকদিন বাদে শকুন্তলা আজ একটু গান করছে। মনের ওপর গভীর একটা অবসাদ অনেকদিন থেকে ঘন হয়ে লেগে ছিলো, আজ যেন তা একটু আলগা হ'য়েছে। চাপাসুরে গান করতে করতে শকুন্তলা খাটের তলা থেকে অযত্নে রাখা বড়ো সুটকেসটি টেনে বের করলো—ছুৎ, ধুলো-বালিতে যাচ্ছেতাই হ'য়েছে। শকুন্তলা তার চান করার তোয়ালে দিয়েই ঝাড়তে আরম্ভ করলো।

যাক্, বাঁচা গেছে। সুটকেসটির পালিশ নষ্ট হয়ে যায়নি। কয়েক-খানা ভালো শাড়ী, ভালো সায়া, চমৎকার সেমিজ, পাউডার, পাফ, স্নো, সেন্ট, চশমার কেস্—শকুন্তলা চট্‌পট্ সুটকেসে পুরে ফেললো! হোল্ডঅল্ কোনটা নেবে? ছোটটাই ভালো। কবিতার খাতাটা? অ্যাটাচি কেস্‌টা? ওঃ ইয়েস, প্যাড। সব শকুন্তলা বেঁধে নিলো। আজই তার চ'লে যেতে ইচ্ছে করছে! ভালো লাগছে না বাপু এই পাহাড়। এখনো পুরোপুরি ছাব্বিশটি ঘণ্টা দেরি। তার ওপর ঘণ্টাগুলোও যেন একটু দীর্ঘায়ু বলে মনে হচ্ছে তার।

বাহাদুর টাকা এনে দিলো। শকুন্তলা নোটগুলো গুণে মনে মনে একটু হিসাব ক'রে নিলো। যাক্ যথেষ্ট কুলিয়ে যাবে। তার ওপর জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই তো বইয়ের হিসাব পাওয়া যাবে।

পরদিন সকাল হ'তে নিখিলবাবু নীচে নেমে এলেন, আজই যাওয়া ঠিক ? আমি তা হ'লে টিকিট কেটে আনি গিয়ে। দরকার কি দেরী করে ? কাটতেই যখন হবে, আর বাজারের দিকেই যাচ্ছি, তখন আর কি, সেখান থেকে স্টেশন তো দু' মিনিটের রাস্তা।

শকুন্তলা ব'ললো, কাটো তাহ'লে।

কার্সিয়াঙ থেকে বিকালের গাড়ীতে শকুন্তলা রওনা হ'লো। পরদিন ভোরে কলকাতায় নেবে সে একটু চিন্তা করলো, এখন সে মেশোমশাইয়ের ওখানে যাবে, না, সোজা ম্যাজেস্টিকে রওনা হবে! ভেবে দেখলো, মেশোমশাইর বাসায় ওঠাই ঠিক। বিকালের দিকেই না হয় হোটেলে গিয়ে উঠবে। কিন্তু মাসীমার আদরে আর অন্নপূর্ণার ছেলেমানুষীতে' তার আর যাওয়া হ'লো না সেদিন বিকালে। তার ওপর বিষ্যুদবারের বার বেলায় যাওয়াও ঠিক না। আসচে সকালে অপূর্বর সঙ্গে একত্রই সে যাবে, ঠিক হ'লো! কিন্তু তার বেডিং ও সুটকেস ? যাই হোক, একটা বন্দোবস্ত হবেই।

অনেক রাত্র পর্যন্ত শকুন্তলা অন্নপূর্ণার সঙ্গে গল্প করলো। তার পর বিছানায় শুলো। কিন্তু রাত্রি চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙে গেলো। তাড়াতাড়ি উঠে কাপড়টি পরে চুলটি আঁচড়ে শকুন্তলা তৈরি হ'য়ে নিলো। অন্নপূর্ণা স্টোভ জ্বেলে দিদিকে চা ক'রে দিলো।

শীতকালের ভোর পাঁচটা বড়ই অন্ধকার! শকুন্তলা একটু দেরি করলো। বড় রাস্তায় ট্রামের ঘণ্টা শোনা যেতেই সে বেরিয়ে পড়লো। নাঃ, আর দেরী করা ঠিক নয়। ট্রেনের সময়টাও সঠিক তার জানা নেই।

অন্নপূর্ণা শকুন্তলার সাহসে স্তম্ভিত হ'য়েছে। বাব্বা, সে তো জীবনে পারবে না এই অন্ধকার রাত্তিরে একা একা কোথাও যেতে!

ঘুম থেকে উঠে মেশোমশাই তো আশ্চর্য! সে কি? অত ভোরে সে আবার গেল কোথায়? নাঃ, যা সব হ'য়েছে, ব'লে তো যেতে হয়! চা-ফা খেয়ে গেছে তো?

শুধু নাকি চাই খেয়েছে, ফা তাব আব খাওয়া হয়নি। মাসিমা একটু রসিকতা করলেন।

কিন্তু শকুন্তলা অনেক বেলা পর্যন্ত এলোনা দেখে মেশোমশার চিন্তা হ'লো। মাসিমার রসিকতা গেল শুকিয়ে। অন্নপূর্ণা কেবল দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তার বাবা ও মার মুখের দিকে তাকাতে লাগলো। সেও কোনো কথা ব'লতে পারলো না।

মেশোমশাই সোজা হ'য়ে বসে ছিলেন, ক্রমে ক্রমে মাথায় হাত দিলেন। অন্নপূর্ণা রাস্তার দিকের জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো, মাসিমা দুই হাঁটু এক সঙ্গে ক'রে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসলেন।

মাসিমা ব'ললেন, একটু খোঁজ তো করতে হয়! বেলা বারোটা বেজে গেলো।

—কোথায় খোঁজ করবো বলো! মেশোমশায় নিরাশ গলায় বললেন।

—তবু বাড়ী থেকে তো বেরোতে হয়! কি যে হ'লো জানি না।

—রাখাল গেল কোথায়?

মাসিমা একটু থেমে বললেন, আজ বড়দিন, তার কলেজে কি কি বলে খেলাধূলা আছে, সেও সকাল বেলা বেরিয়েছে, বোটানিক গার্ডেনে যাবে—সেখানে ফিস্ট হবে, আসতে তার সেই রাত্তির।

—ভালো। আমিই তা হলে বেরোই!

মেশোমশায় বেরিয়ে যাবার কিছু পরে কে যেন দরজার কড়া নাড়লো। ওপর থেকে মাসিমা চাকরকে ডেকে ব'ললেন, দেখতো রে, ভুষণ, কে ডাকে!

—শকুন্তলাদি না তো? অন্নপূর্ণা ধুপধাপ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো! নীচ থেকে চেঁচিয়ে ব'ললো একটু পর: মা, এদিকে এসো।

—কাঁহা-সে আয়া? অন্নপূর্ণা হিন্দিতে আরম্ভ করলো।

—রাইল হোটেল-সে। মাল লেনেকো ওয়াস্তে, মিসিবাবা ভেজা হায়।

অন্নাপূর্ণা দেখলো, লোকটির বুকে লাল সুতো দিয়ে ইংরাজিতে রয়্যাল হোটেল লেখা। মাসিমাও এসে পড়লেন, যখন কিছুটা উপলব্ধি করলেন তখন লোকটিকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললেন।

মেশোমশায় নিরাশ হ'য়ে ফিরে এলেন। কিন্তু বাসায় ফিরে শকুন্তলা মাল দিয়ে দিতে হোটেল থেকে লোক পাঠিয়েছে ও চিঠি দিয়েছে শুনে স্তম্ভিত হলেন। কেন, হোটেলে ওঠার মানে? তিনি কি মরে গেছেন? তাঁর এখানে থাকতে শকুন্তলার আপত্তি কি?

এক্ষুণি তিনি যাবেন, এবং শকুন্তলাকে ফিরিয়ে আনবেন। বড় টাকা বেশি হ'য়েছে সব !

হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে শব্দ করতে করতে তিনি উঠলেন। এবং কোন ঘর জিজ্ঞাসা ক'রে পর্দা তুলেই তিনি পাথর হ'য়ে গেলেন এবং তক্ষুণি মাথা নীচু ক'রে যত জোরে উঠেছিলেন তার চেয়ে আস্তে আস্তে নেমে এলেন। বাসায় ফিরে কাউকে তিনি কিছু বললেন না। দ্বারোয়ানটি তখনো বসে ছিলো, তাকে শকুন্তলার স্যুটকেস বেডিং দিয়ে দিলেন।

তিনি একবার কার্সিয়াঙ যাবেন। আজই। বাসায় কাউকে তিনি কিছুই ব'ললেন না। মাসিমার সহস্র অনুসন্ধিৎসায় তিনি কান করলেন না। কেবল অলস্টার, সোয়েটার, ট্রাউজার ইত্যাদি কয়েকটা শীতের পোষাক নিয়ে পাহাড়ে চ'লে এলেন।

নিখিলবাবু সহাস্যে এগিয়ে এলেন : হঠাৎ তুমি ?

—বেড়াতে। গম্ভীর উত্তর দিলেন মেশোমশায়।

—উঁহুঁ ! নিশ্চয় গূঢ় রহস্য আছে। বলো তো ভায়া ! মেয়ের বিয়ে দিতে ব'সে বুঝি খুব গম্ভীর হ'চ্ছো, ভায়া !

মেশোমশায় এর কোনো উত্তর দিলেন না, ব'ললেন, শান্ত আমার ওখানে নেই। হোটেলে উঠেছে।

—হেতু !

—বলবেন না ! আমি গিয়ে দেখি, হ্যাঁ, হোটেলে তাকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি—ব'লতেও সঙ্কোচ হয়। যাক্ গে, আমি তাকে আর একটি ছেলেকে দেখি, দেখি তারা দু'জন—যাই হোক আমি আর ব'লতে পারবো না। শুধু

এই কথাটি বলার জন্তেই আমি এসেছি। মেসোমশায় মাথা নীচু ক'রে ব'ললেন।

নিখিলবাবু স্তম্ভিত হ'লেন, ব'ললেন, এ-সব কী? বলো ভায়া তুমি! তোমরা তো সমজদার লোক। এই জন্তেই আমি একা একা যেতে দিতে রাজী ছিলাম না। কতবার বারণ করলাম, বুঝলে ভায়া, কিন্তু আমার কথা কে শোনে! তোমরা বিচক্ষণ লোক, তোমরাই বলো।

মা ব'ললেন, তার মানে? আমিই না বারণ ক'রলাম, তুমিই না যেতে দিলে।

—বলো কি? আমি? এই নিখিল সরকার? চুল পেকে পাট হ'লো, কক্‌খনো অমন ভুল করিনি। মেয়েদের আমি কখনোই বিশ্বাস করি না, হোক্ না সে মেয়ে নিজেরই! নাও, এখন ঠেলা সামলাও তুমি! কি কেলেঙ্কারি যে হবে!

—হোক্ কেলেঙ্কারি, আক্কেল হোক্! মা দাঁতের ওপর দাঁত রাখলেন!

ঠিক সেই সময় এখান থেকে বহুদূরে হোটেলের ত্রিতলে ব'সে শকুন্তলা অপূর্বর হাতটি হাতের মধ্যে চেপে ধ'রে মনে মনে দিলীপের কাছে ক্ষমা চাইছে।

তৃতীয় অধ্যায়

দার্জিলিঙের লতা

উৎপল তার রুগীকে খেলা দিচ্ছে : এই তো, এই তো, এই তো আপনি ভাল হ'য়ে গেছেন। বাঁ-হাতে তাহ'লে জোর পাচ্ছেন ব'লতে হবে। আচ্ছা, এবার আনুন তো ওই অ্যালবামটি। হ্যাঁ, আনুন্। ওকি? শুধু ডান হাত দিয়ে কেন? বাঁ হাতটাকেও সাহায্য করতে দিন্।

উৎপল ডাক্তার ভালো। দার্জিলিঙএ তার প্রসার প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্যারালিসিসের রুগীর পেছনে সে যে-পরিশ্রম ক'রেছে, সেটুকু অন্য পথে চালিত করলে সে এতদিনে এভারেস্টএ উঠে যেতে পারতো। দিনের অধিকাংশ সময় তাকে এখানেই কাটাতে হয়। আবার এমন দিনও গেছে, ভগবান করুন তেমন দিন যেন আর না ফিরে আসে, যখন উৎপলকে সমস্ত রাত্তির রুগীর পাশে ব'সে চুপচাপ কাটাতে হ'য়েছে। না, চুপচাপ ঠিক নয়, কথাও তাকে বলতে হ'য়েছে অজস্র। উঃ, সে একদিন গেছে। তখন তো উৎপল কল্পনাও করতে পারেনি-যে সে এ রুগীকে নিরাময়ের দিকে টেনে আনতে পারবে। সে কী ভীষণ বমি, আর সে কী ভীষণ হাত-পা ছোঁড়া।

কিন্তু আজ উৎপল মনে-মনে আনন্দ বোধ করছে, সে রুগীকে নিয়ে খেলা করছে, ব'লছে, চষমাটা খুলে ফেলুন তো। ওকি, বাঁ-হাতও

লাগান। হাত তো আপনার একটা নয়। আচ্ছা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই বইটা এবার একটু পড়ুন তো। Medicine—Bed-side Medicine, হোক্‌না ডাক্তারি বই। ডাক্তারি বই ব'লেই ইংরাজি অক্ষর আপনার কাছে গ্রীক্ নয়। রিডিং দিতে পারবেন না? দিন্।

লতা থিতিয়ে থিতিয়ে পড়তে আরম্ভ করলো। খানিকটা পড়ার পর উৎপল বাধা দিলো, ব'ললো, গ্র্যাণ্ড, এই তো বেশ পড়তে পারছেন। তবে চষমার আর কী দরকার? আর, বাঁ হাতেও তো রীতিমতো জোর পাচ্ছেন। হুঁ হুঁ, ব'ললে শুনছি না, আর আপনার অসুখ মোটেই নেই। অত বড়ো বইটা বাঁহাতের ওপর রেখে কেমন করে প'ড়ে গেলেন বলুন তো!

লতার ছোট ভাই দুর্জয়, দুর্জয়ের বৌ কাবেরী, আর লতার বোন রেখা ঘরের এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। তারা লতার শারীরিক উন্নতিতে মনে মনে অতিমাত্রায় তৃপ্ত হ'লো। দুর্জয় এগিয়ে এসে ব'ললো, আপনার রুগী তো প্রায় অলরাইট।

—প্রায় মানে? উৎপল দুর্জয়ের মুখে তাকিয়ে লতার দিকে ফিরলো, ব'ললো সম্পূর্ণ সেরে গেছেন উনি। এখন ওঁকে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা দরকার। বন্ধ-ঘরের বন্ধ-হাওয়ায় না থাকাই ভালো। আপনারা এর একটু বন্দোবস্ত করবেন পজিটিভ্‌লি।

উৎপল লতাকে ব'ললো, এবার আপনি বসুন, অনেকক্ষণ তো দাঁড়িয়ে আছেন। দিন্, চষমাটা আমার হাতে দিন। পাওয়ার কমিয়ে দিতে হবে। এখন একটু স্ফূর্তি পাচ্ছেন কিনা, সত্যি কথাটা বলুন তো। হুঁ হুঁ, যতই মাথা নীচু করে থাকুন, জানি,

পেতেই হবে। না হ'লে এতোদিন এতো খাটলাম তার কি কোনো পুরস্কার নেই? Remuneration নয়, সোজা বাঙলা ভাষায় যাকে বলে reward।

উৎপলের কথায় রেখা ও কাবেরী দুর্জয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখে কাপড় দিয়ে হেসে উঠলো। দুর্জয়ও হাসলো।

উৎপল যেন কিছু বোঝেনি, এইভাবে চোখে কৃত্রিম বিস্ময় মাখিয়ে ব'ললো, আপনারা হাসচেন?

দুর্জয় আর একটু হেসে ব'ললো, আপনার বাঙলা ভাষা শুনে।

উৎপল উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলো: এই! আচ্ছা, আসি আজ। (লতাকে) আপনি কি বলেন? আবার কাল আসবো, রুটিন-মাফিক সকাল সাড়ে আটটায়, এখন রাত্তির প্রায় (হাতের ঘড়ি দেখে) ওঃ, নিয়ার্লি টেন্?

তাড়াতাড়ি টেবিলের ওপর থেকে ফেল্টহ্যাটটি তুলে নিয়ে মাথায় বসাতে বসাতে ব'ললো: গুড্ নাইট।

লতা স্মিত হাসলো। উৎপলের দিকে চোখ রাখলো, দৃষ্টির আড়ালে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লতা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস (স্বস্তিরই হয়ত) ত্যাগ করে পা টান ক'রে শুয়ে পড়লো।

কাবেরী লতার বিছানার কাছে এসে ব'সলো, কপালে হাত বুলিয়ে ব'ললো, এখন আরাম লাগছে,—না?

রেখা ব'ললো, বৌদির যত নাবোস্তা। আরাম না লাগার কী আছে?

কাবেরী একটু অপ্রস্তুত হ'য়েছিলো, কিন্তু রেখার ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি দেখে সেও হাসলো।

রাস্তায় শব্দ ক'রে উৎপলের মোটর ছেড়ে গেলো।

এখন উৎপলের মনের আনন্দের অন্ত নেই। যে সঙ্কট নিয়ে রুগীটি হাতে এসে পড়েছিলো, তা যে উৎপল কাটিয়ে উঠ্তে পারবে, সত্যি বলতে কি, এ-আশা উৎপলের ছিলো না ব'ললেই হয়। কিন্তু এখন সে আনন্দিত। লতাকে অনেকটা সুস্থ করতে পেরেছে, এতে সে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। এবং সে আত্মতৃপ্তি অনুভব যেন অস্বাভাবিক অতিরিক্ত। এর কারণ আছে।

যে দিন প্রথম উৎপলের ডাক পড়লো লতার 'চিকিৎসার জন্য, সে দিন উৎপল গিয়ে দেখে রুগী বিছানার ওপর অতিমাত্রায় ছট্‌ফট্ করছে। কামড়ে, টেনে বিছানা ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে বিস্তর। জ্ঞান প্রায় নেই ব'ললেই হয়, তবু অস্থিরতার বিরাম নেই। উৎপল ঘরে ঢুকে দেখলো, চার-পাঁচজনে মিলে লতাকে প্রবল বিক্রমে চেপে ধরে আছে। উৎপল বলেছিলো, দিন্, আপনারা ছেড়ে দিন্—একটু ছটফট করতে দিন্ না।

লতার বাবা অধীর গলায় ব'ললেন, কিন্তু খুবই যে ছটফট করেছ, ডাক্তারবাবু !

—তা'তে ক্ষতি হবে না, এ ঘরের ভীড় কাইগুলি একটু কমাবেন। মাত্র একজন দু'জন থাকতে পারেন।

বিছানায় লতা উল্টে পাল্টে যাচ্ছেতাই করছে, একটু গোঙরাচ্ছে, উৎপল সে দিকে মন দিলো না। সে লতার বাবা মৃগাঙ্কবাবুর কাছ থেকে পূর্ব ইতিহাস শুনতে আরম্ভ ক'রে দিলো :

—বছর পাঁচ আগে দারুণ টাইফয়েড হয়। তার আগেই পরীক্ষাটা হ'য়ে গেছে—ইন্‌টারমিডিয়েট, হ্যাঁ, সায়েন্স পড়তো,

কলকাতায় পড়তো। পরীক্ষা দিয়ে এখানে ফিরে আসার পর একটু জ্বর, তার পরই টাইফয়েড়। দু'তিনটে ক্রাইসিস্ পার হ'য়ে পঁয়তাল্লিশ দিনের দিন অন্নপথ্য করে। পথ্যের পরেও যেন লক্ষ্য করা গেলো, পায়ে উপযুক্ত জোর পাচ্ছে না। শেষ-বেশ, যা আশঙ্কা করা গিয়েছিলো, তাই। বোঝা গেলো, বাঁ অঙ্গ একটু অবশ। (লতা এখনও ছটফট করছে, তবে তেজটা একটু কমেছে)।

লতার দিকে তাকিয়ে মৃগাঙ্কবাবু ব'লে গেলেন, বুঝলাম প্যারালিসিস। হাঁটতে ব'ললে বাঁ-পাটা হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যায়, বাঁ-হাতটা ঝুলে থাকে, নডবড় ক'রে নড়ে। কিন্তু মুখের ভাব as usual, কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। আর বলেন কেন দুঃখের কথা, ভেবেছিলাম পরীক্ষা পাশের সংবাদ পেয়েই বিয়েটা দিয়ে দেবো, কিন্তু আমার রুগ্ন মেয়েকে কে এখন বিয়ে করবে বলুন ?

উৎপল মনোযোগ দিয়েই শুনছিলো, বললো, তারপর ?

—তারপর ? মৃগাঙ্কবাবু বিছানার দিকে তাকালেন, লতা এখন শান্ত হ'য়েছে, তবে বিড়বিড করে কি যেন ব'কছে। মৃগাঙ্কবাবু ব'ললেন, ওকি, ও অমন ক'রছে কেন ?

—ও কিছু নয়। উৎপল বললো।

লতার মা অর্ধ ঘোমটায় কপাল ঢেকে দরজার কাছে অপেক্ষা ক'রছিলেন, রেখা ছিলো বারান্দায়, আর দুর্জয় এদেশে নেই-ই তখন। মৃগাঙ্কবাবুর ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে কলকাতা গেছে, সেখান থেকে শিলিগুড়ি হ'য়ে আসবে কথা আছে, আসার দিনও কেটে গেছে, কিন্তু এখনও এসে পৌছলো না, এও কম চিন্তার বিষয় নয়। যাই হোক, মৃণ্ময়ী দেবী—লতার মা—লতার প্রলাপ বকুনি শুনে ধীর

পায়ে বিছানার কাছে গিয়ে ব'সলেন এবং কপালে হাত দিয়ে ডাকলেন, লতা, লতা।

উৎপল কুণ্ঠিত গলায় ব'ললো, থাক, ওতে ভয়ের কিছু নেই। এ অসুখে অমন বকেই থাকে, ওকে ছেড়ে দিন্। হ্যাঁ, তারপর ?

মৃগাঙ্কবাবু বিছানার দিক থেকে চোখ ফেরালেন, উৎপলের দিকে তাকিয়ে ব'ললেন, তারপর হঠাৎ আজ এই উপসর্গ এসে জুটলো। কিছু ভয়ের নেই তো ?

—ভয় ? উৎপল নড়ে ব'সলো : নাঃ, ভাববেন না। এ কি, এখনো বিশেষ খারাপের দিকে যায়নি তো।

উৎপল উঠলো, লতার কাছে গেলো, লতার বাঁ হাতটি আস্তে টেনে নিয়ে নাড়ী দেখলো—দ্রুততা একটু বেড়ে গেছে যেন, ও বাড়বেই। উৎপল বাহ্যত তো নয়-ই, মনে মনেও ঘাবড়ালো না। কিছুক্ষণ নাড়ী দেখার পর সে হাত ছেড়ে দিলো।

মৃগাঙ্কবাবু বিপন্ন গলায় ব'ললেন, কেমন বুঝলেন ?

উৎপল স্টেথেস্‌কোপ কানে লাগাতে লাগাতে ব'ললো, কিছু নয়, ঠিক আছেন। একটু চিৎ করে শুইয়ে দিন্ এঁকে। বুকটা দেখবো।

মৃণ্ময়ী এগিয়ে এলেন, রেখাও আর বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। লতাকে চিৎ ক'রে শুইয়ে মৃণ্ময়ী দেবী কাপড় সরাচ্ছিলেন, উৎপল ব'ললো, দরকার হবে না, থাক না কাপড়। —ব'লে লঙ-চেস্টপিস্ লাগিয়ে বুক থেকে নিজেকে অনেকটা দূরে রেখে পরীক্ষা সুরু করলো।

খুব দ্রুত একটা জুতোর শব্দ শুনে রেখা দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে গেলো, ব'ললো, দাদা এসেছে, মা।

দুর্জয় এসেছে। কলকাতার কাজ সেরে, শিলিগুড়ি হয়ে আসতে আসতে কার্সিয়াঙে সে আটক প'ড়ে যায়, যদিও সে-কথা সে গোপন রেখেছে। বিভ্রাট কম? প্রেমও একটা বিভ্রাটই বটে। কার্সিয়াঙে করতোয়াদের ওখানে কিছু দিন বাস ক'রে, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ক'রে তার শিকড় সেইখানেই গজিয়ে গিয়েছিলো প্রায়, কিন্তু হঠাৎ আজ তাকে এসে পড়তে হলো অকারণে, এসে তো দেখে এই ব্যাপার।

—বুক কেমন দেখলেন? মৃগাঙ্কবাবু শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

স্টেথেস্‌কোপ খুলতে খুলতে উৎপল বললো, না, বুক ঠিক আছে।

সবই যখন ঠিক আছে, তখন ভয়ের কিছু নেই হয়ত। মৃগাঙ্ক-বাবু মনে মনে ভাবলেন। দুর্জয় তার বাবার পিছনে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত দুটো চোখ দিয়ে লতার দিকে তাকিয়ে আছে।

মৃগাঙ্কবাবু জিজ্ঞেস করলেন, মেল্‌এ এলি?

—না, মোটরে। দুর্জয় লতার দিকে তাকিয়েই জবাব দিলো।

—হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু! মৃগাঙ্কবাবু এগিয়ে গেলেন: চোখেরও একটু ডিফেক্ট হ'য়েছে। প্রায় দেখতে পায় না বললেই হয়। না, এক চোখে, বাঁ-টায়।

উৎপল দুটো আঙুল দিয়ে লতার চোখ টেনে ধরলো, একটু ডায়লেটেড হ'য়েছে দেখছি!

—তার মানে? অন্ধ হ'য়ে গেছে নাকি?

—কী যে বলেন? উৎপল হাসলো: চোখের মনিটা একটু বড়ো হ'য়ে গেছে! ভিশন রেসটোরড নিশ্চয়ই হবে।

—আশীর্বাদ করুন, আশীর্বাদ করুন ।

এই রকম গোলযোগের মধ্যে কয়েকদিন কেটে গেলো। দুর্জয় অল্প কয়েকদিনের কড়ার করে কার্সিয়াঙ থেকে—করতোয়ার কাছ থেকে—এখানে এসে আর কোনো সংবাদই দিতে পারলো না, না বা নিতে ।

উৎপল ব'ললো, ব্লাড্ প্রেশার বেড়েছে।

লতা এখন উঠে ব'সছে। উৎপল তাকে একটা উঁচু চেয়ারে পা ঝুলিয়ে ব'সতে ব'ললো। সে এখন তার নী-জার্ক ও এলবো-জার্ক দেখবে। অনেকক্ষণ ধরে হাঁটু আর কনুই পিটে পিটে সে দেখলো, জার্ক একটু ব্রিস্‌কই পাচ্ছে। আরো দেখলো, হাত ও পায়ের মাংসপেশী ক্ষয়িষ্ণু নয়, এ-ও ভরসার কথা, কিন্তু রীতিমতো হাইপারটোনিক্। তার ওপর কাফ মাসল্এর হাইপারটোনিসিটি যেন একটু বেশি।

উৎপল ব'ললো, আচ্ছা, হঠাৎ কোনো শক্ পেয়েছেন ইনি অল্পদিনের মধ্যে ?

মৃগাঙ্কবাবু মৃণ্ময়ী দেবীর দিকে তাকালেন, একটু ভেবে ব'ললেন—সে রকম শক্ তো কিছু নয়, তবে দিন পনর আগে ওর এক খুড়তুতো বোন মারা গেছে।

—এখানে ?

—না, মুসৌরীতে ।

—তার সঙ্গে এর খুবই ভাব ছিলো, নয় ?

—তা, মৃগাঙ্কবাবু ব'ললেন, এক সঙ্গে যখন ছিলো, তখন তা একটু ছিলো বৈ কি।

উৎপল ব'ললো, চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়ুন তো। আচ্ছা, বুকের ওপর দুটো হাত রাখুন। বেশ, এবার ধীরে ধীরে উঠে বসতে চেষ্টা করুন তো। হ্যাঁ, ঐ অবস্থাতেই।

লতা উঠে বসতে চেষ্টা করলো। উৎপল লক্ষ্য করলো, লতার বাঁ-পা-টি অসাড় হ'য়ে প'ড়ে রইলো বিছানার ওপর। কিন্তু ডান-পা একটু ওপর দিকে উঠলো।

উৎপলের যত কিছু যন্ত্রপাতি আছে সবই নিয়ে এসেছে, কারণ ওষুধ দিয়েও যেমন রুগীকে সুস্থ করা যায়, যন্ত্রপাতি দেখিয়েও তা করা যায় বইকি। উৎপল চিন্তা করে দেখেছে—রুগীর মনের ওপর এমন একটা ছাপ দেওয়া দরকার যাতে সে বুঝতে পারে, ডাক্তার তার জন্যে যথেষ্ট করছে। তার ওপর, এ-রোগের যখন কোনো ওষুধই নেই বললতে গেলে। কেবল স্ট্রিকনিন আর ব্রোমাইড্ মিশিয়ে একটু একটু টনিকগোছের ওষুধ। রুগীকে বুঝতে দিতে হবে, যন্ত্রপাতি না দেখিয়ে সেইজন্যে উৎলের উপায় নেই। সবগুলো যন্ত্র টেবিলের ওপর ঢেলে পর পর এক একটা সে লতার দেহের নানাস্থানে নানাভাবে সংযোগ করতে লাগলো। উৎপলের মনে হ'চ্ছে, অবশ্য জোর গলায় সে বলতে পারবে না, তার মনে হচ্ছে, এ যেন হিস্‌টেরিক্যাল প্যারালিসিস্। যদি সত্যিই তা হয়, তবে ভয় নেই মোটেই। ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে, তেমন হবার হ'লে যেমন হঠাৎ আক্রান্ত হয় তেমনি হঠাৎই সেরে যায় এ অসুখ। কিন্তু শাস্ত্রের ওপর সব সময় বিশ্বাস করা চলে না, অন্ততঃ উৎপল তো করে না। শাস্ত্রকার বলেই যে তাঁর ভুল হবে না, এমন কী কথা আছে ?

দিনের পর দিন অতিবাহিত হচ্ছে, কিন্তু উৎপল লতাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করতে এখনো পারেনি। এজন্ত সে মর্মাহত। কিন্তু সে দেখছে, মাস্‌লএর হাইপারটোনিসিটি কমছে এবং ইলেকট্রিক রি-অ্যাকশনও নর্ম্যাল্। এতে সে মনে মনে আশান্বিত,, কিন্তু মনে মনে সুস্থ নয়। লতার ওপর তার আকর্ষণ বাড়ছে, লতার জন্তে তার দিনের অধিকাংশ কেটে যাচ্ছে চিন্তায় চিন্তায়। এর হেতু কি? তা উৎপলই সঠিক খবর রাখে না হয়ত'।

লতাকে হাতে নেওয়ার পর অনেকদিন গত হয়েছে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর অদল-বদল হ'য়ে গেছে অনেক কিছু। সাহিত্যিক শকুন্তলা সরকারকে সে চিকিৎসা করেছে, সে-শকুন্তলা নাকি বিয়ে করে বসেছে অন্ধ্রপ্রবাসী কোন্ এক প্রফেসার সোমকে।

দুর্জয়ের জীবনেবো পরিবর্তন ঘটেছে ইতিমধ্যে। তার জীবনের রথচক্র ঘুরে অনেক কিছু হ'য়ে গেছে ওলট্-পালোট। যে-করতোয়াকে সে ভালোবেসেছিলো, একদিন অতি হঠাৎ দুর্জয় তাকে খুঁজতে গিয়ে তার কোন পাত্তাই পেলো না, শুনলো—সে সেই রাত্রেই কোথায় যে উধাও হয়ে গেছে কেউ সে খবর রাখে না। শেষ-বেশ, ভাবতেও দুর্জয়ের হাসি পায়, তাকে কিনা নিজের মনের সম্পূর্ণ সম্মতি-সহকারে করতোয়ার ছোট-বোন কাবেরীকে বিয়ে করতে হলো।

কিন্তু সে ইতিহাস পুরানো হ'য়ে গেছে। করতোয়াকে দুর্জয় ভুলে গেছে তার হীনতার জন্তে, আত্মিক দীনতার জন্তে। কিন্তু কাবেরী তার দিদিকে 'ভুলতে কেন যে-পারেনি তার কারণ অন্ত। আপনারা সে বৃত্তান্ত আর নতুন ক'রে জানতে চাইবেন না।

পরিবর্তন ঘটেনি শুধু উৎপলের, শুধু লতার। পাশাপাশি হু'টো শাখানদীর মতো তারা হুজন ঘেঁসাঘেঁসি ব'য়ে চ'লেছে।

উৎপল লতাকে উপদেশ দিচ্ছে, বলছে, সর্বদা কোনো একটা কাজ নিয়ে থাকতে, কখনই চুপচাপ ব'সে না থাকতে। যে কোনো একটা কাজ, যাতে হুটি হাত চালিত হওয়ার প্রয়োজন এবং হুটি পা।

উৎপল আর লতা ঘরে ব'সে কথা বলছে, রেখা কাবেরীর হ'য়ে ঘর থেকে হুর্জয়ের সিগারেটের টিনটি নিয়ে গেলো। রেখার সব চেয়ে ছোট ভাই বাদল রেখাকে ব'লছে, আমার হাতে দাও, আমি দিয়ে আসি।

এই। উৎপলের মাথায় বুদ্ধি এসে গেলো, ব'ললো, রেখাদেবী একটু আসবেন তো এদিকে।

রেখা এলো। উৎপল ব'ললো, এক কাজ করুন। বাদলকে সর্বদা এই ঘরে রাখুন, আর খুব হুরন্তপনা করতে দিন, আর লতা-দেবীর ওপর ভার দিন, ওকে সামলাবার। রাজি? কি বলেন, লতাদেবী? এই, এমনি করলেই আপনাব হাতের আর পায়ের কাজ করা হবে। বাদল, শোনো।

বাদল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো, কাছে এলো।

উৎপল ব'ললো তোমার এই দিদিটিকে কি দিদি বলে ডাকো? বড়দি? আচ্ছা, এই বড়দিকে খুব জ্বালাতন ক'রতে পারবে? সব সময় এটা ধরে টানবে, ওটা ধরে টানবে, মাঝে মাঝে যদি পারো তবে তোমার বড়দির চুলের মুঠি ধরেও।—ব'লে উৎপল হেসে উঠ্‌লো।

লতা মাথা নীচু ক'রে কুঁকড়ে ব'সলো। রেখা বললো, যে দুরন্ত ছেলে, বলে দিতে হবে না, তা ও খুবই পারবে।

বাদল ব'ললো, বেশ, পারবোই তো।

—ইয়েস্, এই তো চাই! উৎপল ব'ললো: কিন্তু তোমার মেজদিকে নয়, বড়দিকে।

লতা মাথা নীচু করে একটু হাসলো।

উৎপল ব'ললো, হাসি নয়! সিরিয়াস্লি নিন্। দেখুন না, ক্রমে ক্রমে আমি আপনার ওপর নতুন নতুন কাজের ভার দিচ্ছি। ঘরের ঝুল ঝাড়ে কে?—মতিলাল? না, এ ঘর চাকর ঝাড়বে না, আপনার ঝাড়তে হবে। শুধু ঝাড়তে হবে না, সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বইয়ের সেল্ফ গোছাবেন, আর বাদল, তুমি সব অগোছালো ক'রে দেবে। পারবে?

বাদল ঘাড় অনেকটা কাৎ করে দিলো, বললো, আমিই তো করি—

—থ্যাঙ্ক্যু! উৎপল সজোরে হেসে উঠলো!—কে, দুর্জয় বাবু যে আসুন!

দুর্জয় এলো।

| আফিস থেকে ফিরলেন বুঝি এইমাত্র?

—না। দুর্জয় সিগারেট টান দিয়ে ব'ললো, একটু আগে ফিরেছি।

—কলকাতায় বদলি টদলি করবে নাকি লয়েডস্?

—ব্যাঙ্কের কথা, করলেই হ'লো। কর্তাদের মর্জি। মাস দুই তো হলো ঢুকেছি, আরো চার মাস প্রবাশনার, তারপর তো। নিন্, সিগারেট খান। দুর্জয় টিন খুলে ধ'রলো উৎপলের সামনে!

সিগারেট ধরাতে ধরাতে উৎপল বললো, বাদলকে তো খুব দুরন্তপনা করতে বলে দিলাম।

—দুরন্তপনার কথা বলে দিতে হবে না, নিজেই যথেষ্ট জানে। দুর্জয় বাদলের দিকে তাকালো। বাদল নিরীহের মতো তাকালো উৎপলের মুখে।

উৎপল বললো, নাঃ, বাদল লক্ষ্মী ছেলে। তবে, একটু আধটু যা দুষ্টুমী ক'রে ফেলে হঠাৎ। না বাদল? ভালো কথা, লতাদেবীকে একটু খোলা হাওয়ায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা ব'লেছিলাম, তার কি করলেন?

—রোজই ভাবছি আজ যাবো, কাল যাবো, কিন্তু অফিস থেকে ফিরে আর যাওয়াই হয়ে উঠছে না। দুর্জয় ব'ললো।

—বেশ, সকাল বেলা, খুব ভোরের দিকে।

—তা বরং সম্ভব বটে। বড় কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছি দিন দিন, এর কোনো প্রতিকার আছে আপনাদের শাস্ত্রে? সহাস্য মুখে ব'ললো দুর্জয়।

—আছে বৈ কি! উৎপল ব'ললো, ভেতরে একটা প্রেরণা চাই। এই নিন্ লতাদেবী আপনার চষমা। দুর্জয় পকেট থেকে কেস বের করলো: কথায় কথায় দিতে ভুল হ'য়ে গেছে। পাওয়ার একটু বদলে দিলাম।

মৃগাঙ্কবাবু ঘরে এলেন: কি, ডাক্তারবাবু এসে গেছেন?

—অনেকক্ষণ তো! উৎপল ভালো হ'য়ে ব'সলো।

দুর্জয় তাড়াতাড়ি সিগারেট মেঝের ফেলে জুতো দিয়ে চেপে ধ'রে উঠে দাঁড়ালো।

—কেমন দেখছেন বলুন! মৃগাঙ্কবাবু উৎপলের ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালেন।

উৎপল একটু থেমে ব'ললো, আমি তো দেখছি অতি চমৎকার! সেরে গেছেনই ব'লতে হবে। তবে একটু মর্নিং কিংবা ঈভ্‌নিং ওয়াক্‌ দরকার। কোল্ড-বাথ রেগুলার চ'লছে নিশ্চয়ই? কিন্তু একটা কথা, এখন একটু যেন অনিয়ম না হয়, আবার রিল্যাপ্স ক'রে গেলেই মুস্কিল! কোল্ড-বাথ কন্টিনিউ করুন, তবে মাঝে মাঝে hot sitz bath দরকার। এগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখবেন। চিন্তার তো আর কিছু নেই।

—তা ঠিক, সারিয়ে তো তুলেছেনই ব'লতে হবে! ভালো কথা, আপনার বিল্‌ তো আজো পেলুম না। মৃগাঙ্কবাবু যেন টাকা ট্যাঁকে গুঁজে তৈরী আছেন, এমনি ভাব দেখালেন।

উৎপল ব'ললো, এসে পড়বে নিশ্চয়ই। কারমিনেটিভ মিক্স্‌চার ঠিক মতো খাচ্ছেন তো, লতা দেবী? বাওয়েলের কোনো রকম গোলোযোগ নেই? গুড্‌! এই তো, আর পনর দিন পরেই আপনি ছুটোছুটি করতে চাইবেন। বাদল, যা ব'ললাম মনে রেখো। এখন আমি উঠি।

মৃগাঙ্কবাবু বাদলের মাথায় হাত দিয়ে ব'ললেন, কি ব'লে গেলেন, ডাক্তারবাবু।

বাদল দুর্জয়ের দিকে তাকালো। একটি মাত্র প্রাণী হচ্ছে দুর্জয়, যাকে দেখে বাদল ভয় করে। দুর্জয়ের দিকে তাকিয়ে সে চুপ ক'রে রইলো।

উৎপল ফিরে তাকিয়ে ব'ললো, খুব দুরন্তপনা করতে ব'লে গেলাম।

—ভালো বুদ্ধি দিয়ে গেলেন। মৃগাঙ্কবাবু হাসলেন: এন্‌ভিরো-রেন্স ছুই্‌মির যদি কম্‌পিটিশন হয়, তবে বাদল নির্ঘাৎ ফার্স্ট।

হো-হো ক'রে হেসে উঠে উৎপল সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করলো।

পরদিন ভোরে দুর্জয় লতাকে নিয়ে বেরুলো, রেখা ও কাবেরীও তাদের সহগামিনী হ'লো। মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের গা ধ'রে তারা ওপরে উঠে ম্যালের দিকে যাত্রা করলো। সকালে বাতাসটি মন্দ লাগছে না তাদের। তাদের আজ হঠাৎ খেয়াল হ'লো, ভোরের বাতাস যদি এতো সুন্দর, তবে কেন তারা রোজ রোজ বেরোয় না, এমন বাতাসকে বাইরে ফেলে তারা ঘরে দরজা বন্ধ করে কেন? গভর্ণমেন্ট হাউসের পাশ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে নামহীন ফুল আর লতা-বিতানের তলা দিয়ে খৃষ্টানদের গোরস্থান বাঁয়ে রেখে পেছনে ম্যাল্‌ রেখে তারা ঢালু পথে যাত্রা করলো। চমৎকার আনন্দ লাগছে তাদের। হীল্‌-কার্ট রোড্‌এ প'ড়ে তারা পেছনে ঘুরলো, যত ভোরে তারা রওনা হয়েছিলো সে ভোর এখন বৃদ্ধ সকালে পরিণত হ'য়েছে। এখান থেকে স্টেশন পর্যন্ত যেতে এখনো মিনিট কুড়ি।

দুর্জয় ব'ললো, লতা, হাঁটতে পার্‌ছিস্‌?

লতা ব'ললো, হুঁ।

—কষ্ট হ'লে বল, গাড়ী ডাকি! দুর্জয় হাসলো।

—তোর ইচ্ছে হয় তুই নির্বিঘ্নে গাড়ী চেপে চ'লে যেতে পারিস্‌, অবশ্য বউকে সঙ্গী ক'রে। আমরা দু'বোন হেঁটে যেতে পারবো! লতা একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে ব'ললো।

কাবেরী হাস্‌তে গিয়েই ম্লান হ'য়ে গেলো। এদের দু'বোনে যতটা ভাব, কাবেরীদের দু'বোনের ভাব কি তার চেয়ে কোন অংশে কম ছিলো? কিন্তু তার দিদি গেলো কোথায়? জলে ডুবেই কি সত্যি মরেছে? সে-খবরও কাবেরী সঠিক জানে না।

কার্ট রোডের রেলিঙে ভর দিয়ে তারা সাঙ্কুভ্যালী চা-বাগান দেখতে আরম্ভ করলো। ওপর থেকে বাগানটিকে একটা সবুজ-মিনে-করা পেয়ালার মতো দেখায়। লতা ব'ললো, একদিন ওখানে নেমে গেলে হয়।

দুর্জয় হেসে ব'ললো, হ্যাঁ, খোঁড়া পা নিয়ে খুব যে বড়াই হচ্ছে।

লতা দুর্জয়ের চেয়ে বড় হ'লে কি হবে, দুর্জয় ছেলেবেলা থেকে কোনো দিনই তাকে দিদি সম্বোধন করলো না। তার মতে, মাত্র এক বছরের বড়ো হ'লেই দিদি হওয়া যায় না নাকি।

তারা সাঙ্কুভ্যালী দেখছে, মধ্যসমুদ্র থেকে সুদূর দ্বীপের অরণ্য যেমন মনোরম এবং ঘন দেখায়, এবং সেই দ্বীপে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে সে মোহ যায় কেটে, এ চা বাগানও তাই। ওই যে থোকা থোকা চা গাছ এক সঙ্গে চাপ বেঁধে আছে, কাছে গেলে সব হ'য়ে যাবে ছিন্ন ভিন্ন। সেই জন্যই লতার কথার সমর্থন আমরা করতে পারি না। যাকে তুমি চিরকাল সুন্দর দেখতে চাও, তাকে আত্মীয়তায় বাঁধা ভুল।

কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর তারা রওনা হ'লো। মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের রাস্তা দিয়ে তারা যাচ্ছে, হঠাৎ একটি মোটর তাদের পাশে খুব জোরে ব্রেক ক'রে সশব্দে থামলো। সবাই চমকে উঠতেই উৎপল ব'ললো, অবশেষে! অ্যাটলাস্ট! আজ তা হ'লে আপনারা

বেরিয়েছেন এবং বেড়িয়েছেন! ধন্যবাদ আপনাদের। ব'লেই সে মোটর আবার চালাতে আরম্ভ করলো।

দুর্জয় ব'ললো, কদ্দুর যাচ্ছেন?

—ঘুম। এ-বেলা আপনাদের ওখানে আর যেতে পারবো না। উৎপল গতি কমিয়ে মুখ বের ক'রে ব'ললো: আসতে দুপুর বেজে যাবে। ঘুম থেকে আবার সোনাদহ যেতে হবে। সেখানে ডেয়ারী-ফার্ম-এর ম্যানেজার আবার মর-মর। লতাদেবী, অমন কুঁকড়ে যাচ্ছেন কেন আপনি? ব'লতে ব'লতে পেট্রলের গন্ধপূর্ণ অজস্র ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে উৎপল ডানে স্টেশনের দিকে বেঁকে চ'লে গেল।

লতা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করলো।

বাসায় ফিরে লতা বিছানা নিলো। সে ভয়ানক ক্লান্ত। সকালটা আজ তার ছুটি, আজ উৎপল আসবে না। কিন্তু কেন যে আসবে না, এ লতার ভাল লাগে না কিন্তু। রোজ আসতে পারে আর আজ ঘুমে না গেলেই চ'লতো না যেন। লতা চুপচাপ শুয়ে রইলো।

বাদল এসে তাকে সত্যি জ্বালাতন করতে আরম্ভ করে দিলো। লতা একটু শুয়ে আছে আর বাদল তাকে ঠেলছে, ব'লছে, কেন সকালবেলা আমাকে ডেকে তুললে না, কেন সঙ্গে বেড়াতে নিয়ে গেলে না। এই বড়-দি, বড-দি! ধেৎ! কিসুতেই যদি কথা বলে! এই বড়-দি!

লতা ব'ললো, এখন না, পরে আসিস্ লক্ষীটি!

কাবেরী এসে ব'ললো, দিদি, এই যে খাবার উঠুন!

বিকালে উৎপল এলো। ডেয়ারী ফার্মের ম্যানেজারটিকে ধন্যব

করে সে ফিরে এসেছে। এতদিনের রুগী। উৎপলের মনটাও এখন বিশেষ সুবিধের নয়। ব'ললো, সকালে কত দূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন ?

—অনেক দূর। লতা একটু একটু ক'রে সবটুকু ব'ললো।

উৎপল ব'ললো, প্রথম দিনেই অতটা ঘোরা উচিত হয়নি। খুব বেশি যদি হাঁটেন তবে এক মাইল।

লতা ব'ললো, সাত দিনেরটা এক দিনে হেঁটেছি, আর তো এক সপ্তাহ যাওয়া হবে না।

—কেন ?

—দেখবেন্।

মৃগাঙ্কবাবু এলেন, বিনা ভূমিকায় তিনি আরম্ভ করলেন, রেখার বিয়ে তো ঠিক ক'রে ফেললাম, ডাক্তারবাবু।

উৎপল ঘুরে বসলো : বড় বোন থাকতে—

মৃগাঙ্কবাবু ব'ললেন, লতা তো বিয়ে করতে চায় না। বয়সও পঁচিশ হ'য়ে গেলো ওর। যদি বিয়ে হবার হ'তো তবে পাঁচ বছর আগেই হ'তো, হঠাৎ অসুখ ক'রে ব'সতো না। মৃগাঙ্কবাবু লতার দিকে তাকালেন।

লতা মাথা নিচু ক'রে ব'সলো।

একটু পরে মৃগাঙ্কবাবু আবার ব'ললেন, এ ছেলেটাও ভালোই পেয়ে গেলাম, রুড়কিতে পড়ছে, স্বাস্থ্যও—

উৎপল হেসে উঠ্‌লো, তা বটে, যতদিন ছাত্র থাকে। কিন্তু তারপর ?

—পরের কথা কি ব'লবো বলুন। দেখে শুনে তো সুপাত্রই দিলাম, এখন মেয়ের বরাৎ।

—কবে ঠিক হ'লো ? এই শ্রাবণেই ? আন্তরিক গলায় জিজ্ঞাসা করলো উৎপল।

—হ্যাঁ। মৃগাঙ্কবাবু থিতিয়ে থিতিয়ে আরম্ভ করলেন : তারা তো বিশে তারিখেই দিতে চায়। আমিও বলি, যত শিগ্গির শুভ কাজ মিটে যায়, ততই ভালো।

—তা তো বটেই। উৎপল সায় দিয়ে গেলো।

মৃগাঙ্কবাবু এ-ঘর থেকে চ'লে যাওয়ার পর উৎপল সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলো লতাকে, কেন, আপনি বিয়ে করতে চান্না কেন ?

লতা উত্তর দিলো না।

দরজার দিকে তাকিয়ে চেয়ারটিকে কাৎ ক'রে নিয়ে উৎপল আবার জিজ্ঞাসা করলো, বলুন, কথা বলুন।

লতা সংক্ষিপ্ত ভাষায় ব'ললো, এম্নি !

—এম্নি একটা ওজুহাতই নয় ! খুলে বলুন তো আমাকে। বিয়ে না করলে আপনার উপায় নেই, সত্যি কথা ব'লছি আপনাকে খুলে। উৎপল আবার দরজার দিকে তাকালো : অসুখ তো আপনার সেরেই গেছে, আর বাধা কি ? বলুন, কথা বলুন ! বিয়ে করতে ইচ্ছে করে না ?

লতা চুপ ক'রে রইলো।

—চুপ করে থাকবেন না। একটু গলা পরিষ্কার ক'রে উৎপল ব'ললো : আমি ডাক্তার, আমার কাছে লজ্জা ক'রে চুপচাপ ব'সে থাকলে ঠকবেন। সব যদি খুলে না বলেন তবে চিকিৎসা কি ক'রে করি বলুন তো ! বলুন, বিয়ে করতে ইচ্ছা হয়'না ?

লতা দরজার দিকে তাকালো।

উৎপল ব'ললো, কে? বাদল? এসো।

বাদলকে কাছে টেনে নিয়ে ব'ললো, আপনি কথা বলুন, লতা দেবী। ব'লবেন না? আচ্ছা, ভেবে ঠিক ক'রে রাখবেন, আমি এ-কথার উত্তর চাইই কিন্তু। বাদল, তোমার বাবা কি করছেন?

—মা-র সঙ্গে কথা ব'লছেন?

—তুমি দুষ্টুমি করেছো?

—হ্যাঁ—অ্যাঁ। বাদল ঘাড় অনেকটা কাৎ ক'রে দিলো।

—যাও, তোমার বাবাকে একবার ডেকে নিয়ে এসো। উৎপল বাদলকে ছেড়ে দিলো।

মৃগাঙ্কবাবু এলে উৎপল লতার শরীর সংক্রান্ত নানা বিষয় আলোচনা করতে আরম্ভ ক'রে দিলো। রেখার বিয়ের কথাও প্রসঙ্গক্রমে উঠে পড়লো। রেখা হঠাৎ ঘরে এসে প'ড়েছিলো, তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলো। মৃণ্ময়ী দেবীও এলেন, দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ব'ললেন, রেখা, সন্ধ্যের বাতিটা জ্বেলে আয় তো ওপরে।

উৎপল ব'ললো, আমি একদিন লতাদেবীকে নিয়ে বেড়িয়ে আসবো ভাবছি। অবশ্য হাতে কাজ একটু কম থাকলে।

লতার বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেঁপে উঠ্লো, সে তার মা বাবা কিংবা উৎপল কারো মুখের দিকেই তাকাতে পারলো না।

মৃগাঙ্কবাবু মৃণ্ময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ললেন: নিশ্চয়, যাবেন নিয়ে একদিন। টাইগার হিলে যাবেন বুঝি?

—নাঃ! উৎপল ব'ললো: এই দার্জিলিঙএই! একটু রাস্তায়!

—ওঃ, তা যাবেন। মৃগাঙ্কবাবু লতার মুখের দিকে তাকালেন, সে মুখ যতটা উজ্জ্বল তার ঢের বেশি পাংশু।

সেদিন উৎপলের বিদায়ের পর কয়েকদিন দেখতে দেখতে গত হ'য়ে গেল। ক্রমশ বাড়ীতে লোক সমাগম হ'লো সুরু। আজ রেখার বিয়ে। বর এবং বরযাত্রী কলকাতা থেকে দার্জিলিঙ মেল্‌এ এসে শিলিগুড়ি থেকে মোটর নেবে কথা আছে, এবং তদনুযায়ী বন্দোবস্তও মৃগাঙ্কবাবু করিয়েছেন। কাবেরীর কাকা গত কাল এসে গেছেন, কাবেরী কাকার সঙ্গে ওপরের ঘরে বসে কথা ব'লছে।

উৎপল কয়েকদিন আসছে না কেন? তার কোনো অসুখ-বিসুক করেনি তো? ডাক্তার ব'লেই অসুখ করতে বাধা কি? লতা একা একা শুয়ে, বুকের ওপর একটা খোলা বই উপুড় ক'রে রেখে চুপচাপ পড়ে আছে। বিয়ে, উৎপল একটা উত্তর চায়ই, কিন্তু লতা কী উত্তর দেবে। যেটুকু সে উত্তর দিতে চায়, সেটুকু কথা তার কণ্ঠনালী পর্যন্ত এসে বারে বারে সসঙ্কোচে ফিরে যাচ্ছে যে।

বাইরে মোটরের শব্দ হ'লো। এই, লতা তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে চুল, কাপড় ঠিকঠাক ক'রে নিলো, উৎপল এসেছে নিশ্চয়। হাতের বইটা সে রেখে দিলো। এঃ, দেখেছো! ঘর এমন এলোমেলো হ'য়ে আছে। ইলেক্‌ট্রিকের তারটা অমন ঝুলে আছে কেন ওখানে? টেবিলের ওপর কলমগুলো অমন ক'রে ছড়িয়ে রাখলো কে? নাঃ, কয়েকদিন সে একটু ঢিল দিয়েছে আর অমনি। মতিলালটা কি এ-ঘরের কিছু করতে পারবে না? তাড়াতাড়িতে সে কী বা করবে, ততক্ষণে উৎপল ঘরে ঢুকে পড়বে নির্ঘাৎ।

কিন্তু উৎপল নয়, বরযাত্রীরা এসেছে। লতা ভেঙে পড়লো, তার শরীরটা আজ কিছুতেই ভালো লাগছে না।

বিকাল বেলা যখন বাড়ীতে লোক ধরে না, সবাই তাড়াহুড়ো ক'রে ছুটাছুটি ক'রে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, তখন হঠাৎ, অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে উৎপল এসে উপস্থিত হ'লো।

লতা তার জন্যে প্রস্তুত ছিলো না। তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে সে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

ঘরে ঢুকেই উৎপল ব'ললো, চলুন, আজ বেড়াতে যাবো। হেঁটে যাবেন? আচ্ছা বেশ, তাই সই। গ্যারেজে মোটর ঢুকিয়ে রেখে দুজনে—এই যে, আসুন! খুব বিয়ে লেগে গেছে দেখছি। আমরা একটু ঘুরে আসি গিয়ে। লতা দেবীকে নিয়ে যেতে চাই, কোনো অসুবিধে হবে না নিশ্চয়।

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, না, না, যান্ না। ওই, কে যেন আবার ডাকছে। আমি চলি, আপনারা আসুন ঘুরে। লতা, যাও। মৃগাঙ্কবাবুর কাঁধে তোয়ালে ছিলোই, শশব্যস্তে তিনি ছুট্ দিলেন।

লতা হাঁটু ভাঁজ ক'রে ধীরে ধীরে খাটের কিনারে এসে, আরো ধীরে ধীরে নামলো।

রামকৃষ্ণ মিশনের চত্বরে তারা দুইজন ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়াল।

উৎপল ব'ললো, চলুন, এখন বাড়ীর পথেই পা বাড়াই।

কিন্তু অন্তরত উৎপলের ফেরার ইচ্ছে নেই আদৌ। কারণ, লতার কাছ থেকে যে উত্তর সে চেয়েছে, তা এখনো তার জিজ্ঞাসাই করা হয়নি।

উৎপল ব'ললো, আপনাকে কেন সঙ্গে ক'রে বেড়াতে নিয়ে এসেছি, বুঝতে পারছেন?

লতা উৎপলের মুখের দিকে তাকালো, ব'ললো, কেন?

—ইল্ লাক্! আমারই দুর্ভাগ্য সেটা। উৎপল একটু ম্লান হেসে ব'ললো, কই, সে প্রশ্নটির জবাব তো আজো দিলেন না!

—কোন্ প্রশ্ন বলুন তো। লতা চষমার পাশ দিয়ে উৎপলের দিকে তাকালো।

উৎপল ব'ললো, বসুন! বলছি, মেধা আপনার এতো দুর্বল?

কোঁচার প্রান্ত দিয়ে সিঁড়িটা ঝেড়ে তারা ব'সে পড়লো।

উৎপল ব'ললো, বলুন তো বিয়ে করতে ইচ্ছে করে কিনা। চুপ ক'রে থাকবেন না, আমাকে আপনার মন জানতে দিন। কেন বিয়ে করবেন না?

লতা সোজাসুজি ব'ললো, আমি যদি জানতে চাই আপনি কেন বিয়ে করেননি।

—তার উত্তর পরে দেব। আপনি আগে আমার কথার উত্তর দিন। হেতুটা জানতে পারি? উৎপল লতাকে লুকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেললো।

—ইচ্ছে ক'রে না। লতা উৎপলের দিকে না তাকিয়েই ব'ললো।

—কেন? ইচ্ছে না করার কী আছে? বলুন, কথা বলুন্।

লতা একটু থেমে ব'ললো, আমার মতো বুড়ো মেয়েকে কে বিয়ে করবে বলুন।

—যদি, উৎপল ন'ড়ে ব'সলো : যদি আমি বিয়ে করি?

লতা ব'ললো, এবার বাড়ী চলুন। উঠুন।

—উঠ্‌বো না। উৎপল দৃঢ় হ'য়ে ব'সলো : আগে আমার কথার উত্তর দিন।

লতার দেহের ভিতর দ্রুতবেগে ইঞ্জিন চ'লছে। তার প্রতি রোমকূপ কণ্টকিত হ'য়ে উঠছে। তার কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগছে। এই কথা বলার জন্যেই কি উৎপল তাকে বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে এলো? নাঃ, লতার ভালো লাগছে না, এখন তার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে।

লতা কিছুতেই উত্তর দিলো না দেখে, উৎপল ব'ললো, তবে চলুন।

বাড়ীতে এসে দেখে, বিয়ের হৈ চৈ ছাড়াও একটা বাড়তি হৈ চৈ আরম্ভ হ'য়েছে যেন। সে কি? তারা দুজন দ্রুত ঘরে ঢুকলো, অ্যাঁ? বাদল? বাদল মোটর চাপা পড়েছে? চাপা নয়, ধাক্কা?

উৎপল লতাকে ছেড়ে বাদলের ওপর উপুড় হ'য়ে পড়লো। গায়ের কয়েকটি জায়গায় বিষম কেটে গেছে, উৎপলকে খুঁজে খুঁজে নাকি সকলে হয়রান। শেষ বেশ নন্দবাবুকে আনতে হ'লো। তিনি ওষুধপত্র দিয়ে গেছেন। অ্যান্টি-টিটেনিক্ ইন্‌জেক্‌শন্‌ও দিয়ে গেছেন একটা। উৎপল দেখেশুনে ব'ললো, কিছু নয়। কেউ ঘাবড়াবেন না। কি বাদল? কেমন, ব্যথা করছে?

উৎপলকে পেয়ে বাদলের মুখ প্রফুল্ল হ'লো। বাদল ব'ললো, এমন বদমাইস জানেন, আমি দৌড়ে রাস্তার ওপারে যাচ্ছি, আর অমনি ধাক্কা মারলো। হর্ন দিতে জানে না।

লতা বাদলের কাছে ব'সে আস্তে আস্তে ব'ললো, কেমন লাগছে রে?

—কেমন আবার!' আমি এবার উঠবো। বিয়ে আরম্ভ হয়ে গেছে? বাদল গায়ের চাদর ফেলে লাফিয়ে উঠে ব'ললো।

লতা না হেসে পারলো না, উৎপলও। ঘরে যত লোক ছিলো সকলেই হেসে উঠলো।

মৃগাঙ্কবাবু ব'ললেন, তেম্‌নি কি ছেলে? পাঁচডিগ্রি জ্বর নিয়েও ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়। সাধে কি ওর নাম বাদল?

বিয়ে আরম্ভ হ'য়ে গেল সময় মতোই। বাদল তার মেজদির কাছে গিয়ে শান্ত ছেলেটির মতো ব'সে আছে। আত্মীয়া অনাত্মীয়া মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে লতাও ঝলমল পোষাক পরিহিতা হ'লো।

উৎপল দূর থেকে লতার দিকে তাকালো। রামকৃষ্ণ মিশনেব সিঁড়ির ওপর ব'সে সে লতার মুখের যে-ভাব দেখছিলো, এখন সে-ভাব আব খুঁজে পাচ্ছে না। লতা একটু লতিযে লতিয়ে হেঁটে ভীড়েব মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

অনেক রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে উৎপল ফিরে গেলো।

শেষ রাত্তিরে বাদলের গা ভ'রে পরিষ্কার জ্বর এসে গেলো। কিন্তু তাতে ব্যস্ত হবার কিছু নেই। বিয়ের পর বর-বউ এখন বাসরে। লতা বাদলেব পাশে শুয়ে বাদলের বুকের ওপর হাত দিয়ে ভাবছে উৎপলের কথা। উৎপলের এতো অনুরোধ সত্ত্বেও সে কেন-যে কোনো উত্তর দিলো না! উৎপল নিশ্চয় তার ওপর ভয়ানক চ'টেছে। এবার এক দিন জিজ্ঞাসা করলে হয়, সে ঠিক তার উত্তর দেবে। উৎপল তাকে একটু নির্লজ্জ ভাববে তো, ভাবুক্‌।

পরদিন সকলের আশীর্বাদ বহন করতে করতে পাঁচটার গাড়ীতে বরপক্ষ কন্যাসহ রওনা হ'লেন। মঞ্চ গড়তে যে উৎসাহ দেখা যায়, ভাঙার সময় সে উৎসাহ আর থাকে না। বিয়ের হাঙ্গাম চুকাবার

পর উৎসব-শেষের প্রদীপের মতো সকলের উৎসাহ টিম টিম করে জ্বলছে।

কিন্তু বাদলের জ্বর যেন আরো বাড়ছে, সেই সঙ্গে গালে কপালে চাকা চাকা রক্ত জমার মতো দাগ দেখা যাচ্ছে যেন। তৎক্ষণাৎ উৎপলের ডাক পড়লো।

উৎপল এসে দেখে, বাদল একটু ছট্‌ফট করছে। উপুড় হ'য়ে ভালো ক'রে দেখলো, রক্তের চাকা মতো গালে কপালে লাল লাল দাগ। উৎপল বাদলের জামা খুলে ফেললো,' হুঁ, যা ভেবেছে, গায়েও।

উৎপল ব'ললো, অ্যান্টি-টিটেনিক সিরাম দেওয়া হ'য়েছে, না? দুর্জয়বাবু, নন্দবাবুর কাছে যান্ তো শীগগির। তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রে আসুন, কত ইউনিট তিনি ইন্‌জেক্ট করেছেন। বলবেন : উৎপলবাবু জানতে চেয়েছেন। শীগ্‌গীর ক'রে চলে যান্! উৎপল ঘন হ'য়ে বাদলের পাশে ব'সে তার নাড়ী ধরলো।

মৃগাঙ্কবাবু ব'ললেন, কেমন দেখছেন?

পাংশু মুখে উৎপল ব'ললো, না, কিছু নয়।

চোখ বড় বড় ক'রে বাদল চারদিকে তাকাতে লাগলো। বালিশের সঙ্গে মাথা ঘষতে লাগলো, মৃণ্ময়ী দেবী কাছে এসে ব'ললেন, বাদল, অমন করছ কেন?

দুর্জয় ফিরে আসতেই উৎপল উঠে গেলো বাইরে, জিজ্ঞেস করলো, কত ইউনিট?—অ্যাঁ, সে কি? সে যে অ্যাডাল্ট্ ডোজ। মাত্রা বেশি হ'য়ে গেছে, আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

উৎপল দুর্জয়কে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। ওষুধপত্র নিয়ে ফেরার

আগেই বাদলের খাস উঠ্তে আরম্ভ হ'য়ে গেছে। অক্সিজেন, উৎপল আবার দুর্জয়কে অক্সিজেন আনতে পাঠালো।

ঘর এখন স্তব্ধ, কেবল মৃন্ময়ী দেবী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। লতা কেবল তাকাচ্ছে এর-ওর মুখের দিকে। উৎপল ব'ললো, কাঁদবেন না, কাঁদবেন না! আগে রুগী বাঁচাবার চেষ্টা করুন।

দুর্জয় এখনো আসছে না কেন! উৎপল বার-বার বাইরে তাকাচ্ছে এবং বাদলের দিকে তাকাচ্ছে! হঠাৎ বাদলকে ছেড়ে দিয়ে উৎপল উঠে কোনোদিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। তার পেছনে সমস্ত বাড়ী ততক্ষণে হাহাকার করে উঠেছে।

বাদলের মৃত্যুর পর কয়েকদিন গত হ'য়েছে। উৎপল আর ওদের ওখানে কোনো প্রকারেই যেতে পারছেনা। এতদিনের এতো প্রচেষ্টায় একটি রুগীকে সে আরোগ্য করলো, কিন্তু তার সামান্য অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এমন একটা সাংঘাতিক কাণ্ড হ'য়ে গেলো! নন্দবাবুর ওপর তার ভয়ানক রাগ হ'চ্ছে। কিন্তু দুর্বলের মতো রেগে লাভ নেই। দুর্বলের মতো বৃথা আস্ফালনে কোনোই ফল হবে না। আবার হয়ত' এমনো হ'তে পারে, বাদল অ্যানাফিলাক্সিস্-এ মারা গেছে। নন্দবাবু ভুলক্রমে কনট্রোল টেস্টটি ক'রে নেননি। ভুল তো মানুষ মাত্রেরই হয়।

উৎপল মনে মনে ঠিক ক'রে আছে, আর সে কিছুতেই যাবে না ওদের ওখানে। কিন্তু লতার আকর্ষণে মাঝে মাঝে সে তার অপ্রকাশিত প্রতিজ্ঞার বিপক্ষে না দাঁড়িয়ে পারে না।

অনেকদিন পর দুর্জয় এসে উপস্থিত। উৎপল তখন তার ডিস্‌পেন্সারীতে চুপচাপ ব'সে ছিলো।

উৎপল ব'ললো, কি খবর, দুর্জয়বাবু?

দুর্জয় ব'ললো, আবার তো—

—আবার তো, কি? বলুন! উৎপল টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকলো।

—লতার অসুখ আবার তো বাড়লো।

—কি রকম? উৎপল চোখ বড়ো বড়ো ক'রে তাকালো।

দুর্জয় ব'ললো, ক্রমে ক্রমে সব লক্ষণগুলোই আবার দেখা দিচ্ছে। হাতে পায়ে জোর একেবারেই ক'মে গেছে।

—বিছানা থেকে উঠতে পারে না?

—উঁহুঁ! দুর্জয় টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে দাগ কাটতে লাগলো।

একটু থেমে উৎপল ব'ললো, আবার ঘুরে পড়লেন তবে। এ-আশঙ্কা আমিও ক'রেছিলাম, নতুন একটা শক্ পেলেন সম্প্রতি।

দুর্জয় ব'ললো, শক্ ব'লে শক্! বাদলটা ছিলো যেমন দুরন্ত, তেমনি আদরের। সুধু ওর অভাবেই বাড়ীটা এখন একেবারে ফাঁকা।

উৎপল ব'ললো, হুঁ। কিন্তু এ-রুগী নিয়ে তো আবার বিপদ্ হলো।

দুর্জয় ব'ললো, এখন যাবেন?

—চলুন। দেরাজের চাবী ঘুরিয়ে উৎপল উঠে দাঁড়ালো: দেখি আবার কতদূর এগিয়ে আছে কেস্‌টা।

ঠিক, উৎপল যা ভেবেছে তেমনি বমি, তেমনি ডিলিরিয়াম্, সব লক্ষণই সেই আগের মতোই। উৎপল লতার পাশে গিয়ে ব'সলো, লতার হাত নেড়ে-চেড়ে দেখলো। আবার তাকে প্রথম থেকে চিকিৎসা আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু এবারে কৃতকার্য হবে কিনা ভগবানই জানেন। লতার এখন মোটেই জ্ঞান নাই, বৃথা তাকে ডাকতে যাওয়া। বৃথা এখানে ব'সে থাকা। উৎপল চলে গেল, ব'লে গেল, সে আবার আসবে।

মৃগাঙ্কবাবু ও মৃন্ময়ী দেবী বাদলের শোক ভুলতে পারেননি এখনো। তাঁর বাড়ী এখন একেবারে ফাঁকা। একে রেখা বিয়ে হবার পর আর ফেরেনি, সে বাদলের মৃত্যুসংবাদে কতটা আর্তনাদ ক'রেছে সে খবরও রাখেন না। তার ওপর দুর্জয়ের আবার কলকাতায় বদলি হবার কথা হ'চ্ছে। সকলে মিলেই তাঁরা না হয় কলকাতা চ'লে গেলেন। এদেশে থাকা তাঁদের অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে।

উৎপল রোজই আসছে। তার যত শক্তি সবটুকুই সে লতার দিকে কাৎ ক'রে ধ'রেছে। কিন্তু উপকার কিছু পাচ্ছে ব'লে তো তার মনে হ'চ্ছে না।

কিন্তু এক দিনেই অমন উপকার পাওয়া যায় না! উৎপল ধৈর্য ধরলো। লতাকে ব'ললো, আপনি আপনার মন থেকে সব দুশ্চিন্তা দূর করে ফেলুন তো। কি হ'য়েছে, একবার যে-অসুখ সারে, সে-অসুখ দ্বিতীয়বারও সারে। কেন সারবে না? আচ্ছা, চোখটাও একটু অসুবিধা দিচ্ছে?

লতা ঘাড় কাৎ ক'রলো। লতার অসুখ ছাড়াও একটু অস্বস্তি অনবরত মনের মধ্যে খোঁচা দিয়ে যায়, উৎপল তাকে যে-কথা

জিজ্ঞেস ক'রেছিলো, সে তো তার উত্তর দেয়নি। উৎপল সে জন্য তার ওপর অভিমান করেছে নিশ্চয়ই। লতা তার কাছে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু ক্ষমা চাওয়া সোজা কথা নয়, ক্ষমা চাইতেও মনের উপযুক্ত শক্তি দরকার।

উৎপল লতার সঙ্গে বিশেষ কথা ব'লছে না। চুপচাপ মাথা নীচু করে ব'সে কী যে ভাবছে, লতা তা জানেনা। উৎপল ভাবলো, এক কাজ করলে হয় না? আজই সে মৃগাঙ্কবাবুকে বলুক্, মুখ বুজে ব'সে থেকে কোনো কাজই হয় না। কেনই-বা সে মনের মধ্যে তার আন্তরিক ইচ্ছাটাকে পোষণ করবে?

মৃগাঙ্কবাবু ঘরে আসতেই উৎপল মরিয়া হ'য়ে ব'লে ফেললো, আপনার সঙ্গে কয়টি কথা আছে।

—কি কথা বলুন। মৃগাঙ্কবাবু কান পেতে দিলেন।

একটু থেমে উৎপল ব'ললো, আমি এ রুগীকে কলকাতা নিয়ে যেতে চাই।

—কলকাতা? কেন বলুন তো? খুবই কি বেড়েছে অসুখ?

—না, তার জন্যে নয়। তবে সেখানে চিকিৎসার সুবিধে হবে।

মৃগাঙ্কবাবু ব'ললেন, হাসপাতালে রাখার বন্দোবস্ত করবেন বুঝি?

—তা, তা কেন? বাসায় থাকবে।

—বাসায়? ওখানে বাসা কোথায়? দুর্জয় আগে বদলি হোক। মৃগাঙ্কবাবু ব'ললেন।

উৎপল একটু ভেবে ব'ললো, কেন, আমাদের বাসায়! সেখানে যথেষ্ট ঘর আছে।

লতা বজ্রাহতের মত স্থির দৃষ্টিতে উৎপলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

—তা কি হয়? মৃগাঙ্কবাবু গাঁইগুঁই করতে করতে ব'ললেন।

উৎপল একটু থেমে জুতোর মাথা দিয়ে মেজে ঠুকতে ঠুকতে ব'ললো, কেন হবে না? ধরুন, যদি ওকে বিয়ে করি।

লতা নিষ্পলক তাকিয়ে আছে উৎপলের দিকে।

মৃগাঙ্কবাবু ব'ললেন, বিয়ে? সে কি? আমার রুগ্ন মেয়েকে আপনি—

উৎপল জবাব দিল না।

চতুর্থ অধ্যায়

ছায়ানটী

গ্লানিহীন সুদীর্ঘ তিনটি বৎসর প্রবাসে কাটানোর পর অপূর্ব আর শকুন্তলা পূজোর বন্ধে কলকাতায় এসে পৌছলো,। তাদের জীবনের কিংবা এই মহানগরীর কোনো পরিবর্তনই তাদের চোখে পড়লো না। তিন বৎসর আগে যেমন, আজ এই তিন বৎসর পরেও তেমনি তাদের জীবন সুচারুভাবে কলকাতার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে।

শকুন্তলা কিন্তু উৎপলের কথা একটুও ভুলে যায়নি। উৎপলকে সে অনিবার্য সত্যতায় জাগ্রত রেখেছে উৎসব সভার ঈষদুজ্জ্বল শাদা মোমবাতির শিখার মতো। মুমূর্ষুর চোখের চাউনির মতো তার স্মৃতিকে সে ঘোলাটে ক'রে ফেলেনি।

কলকাতায় তারা এসেছে অনেক কারণে। এক, অনেকদিন এ-দেশ থেকে তারা নির্বাসিত; দুই, আত্মীয়-বন্ধুর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ নেই অনেকদিন; এবং তৃতীয়ত ও প্রধানত, শকুন্তলার 'অবধারিত' উপন্যাসটি সম্প্রতি এক প্রয়োগ-শিল্পী চিত্র-কথায় রূপান্তরিত ক'রেছেন। দেনা-পাওনা মেটানোও একটি কথা, তার ওপর ছবিটা দেখারও আছে প্রবল আগ্রহ। আসচে-কাল ছবিটা নাকি মুক্তিলাভ করবে। আনন্দের কথা বই-কি।

কলকাতায় এসে তারা নতুন নতুন সংবাদ শুনলো। শুনলো, উৎপল নাকি দার্জিলিঙের মায়া ছেড়ে এখানে এসে গেছে।

ল্যান্সডাউনে থাকে। বিয়ে করেছে নাকি একটি রুগ্ন মেয়েকে। কাবেরী, যার সঙ্গে শকুন্তলার দেখা হ'য়েছিলো কার্শিয়াঙে, সে নাকি এক ভদ্রলোককে বিয়ে ক'রে দারুণ সংসারী হয়ে একটা বাসা নিয়েছে। আশ্চর্যের কথা, আর আশ্চর্যই বা কী, কাবেরীর নাকি ইতিমধ্যে দুটি ছেলেও হ'য়েছে।

অপূর্ব ঢিলে পায়জামা প'রে ঘরের মধ্যে পায়চারী করছিলো। পুরানো হোটেল, চেনা-জানা আছে সকলের সঙ্গেই, অসুবিধে আর কী, বলো! শকুন্তলা মস্ত সুটকেসটি একেবারে চিৎপাৎ ক'রে খুলে ফেলে টুকিটাকি জিনিষপত্র বেছে বেছে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখছিলো, বললো, ডিরেক্টারীটা দেখো তো, উৎপল মিত্রর ফোন্ নম্বরটা কতো।

অ্যাশ-ট্রের হাতলে অর্ধদগ্ধ ধূমায়মান সিগারেটটি রেখে অপূর্ব ডিরেক্টারী খুললো। খুলে ব'ললো, মিটার না মিত্র?

—কি জানি, দু'টোই দেখো! ব'লে হাতের কাজ রেখে শকুন্তলাও অপূর্বর কাঁধের পাশ দিয়ে উঁকি দিলো, ব'ললো, ডাক্তার, এম্ বি, ডি টি এম্।

—উঁহু! অপূর্ব পাতা উল্টে গেলো: মিত্রর নেই, মিটার দেখি।

শকুন্তলা ব'ললো: চমৎকার লোক, তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে দেবো!

—এই যে। পেয়েছি। ল্যান্সডাউন তো? অপূর্ব আঙুল দিয়ে দেখালো।

শকুন্তলা উপুড় হ'য়ে দেখে ব'ললো, হ্যাঁ! দেখি নম্বরটা। দাঁড়াও, ফোন্‌টা ক'রেই ফেলি আগে!

অপূর্ব ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লো, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে পরম আরামে চোখ বুজে সিগারেট টানতে লাগলো।

শকুন্তলা ব'লছে, হ্যালো, ইয়েস। ল্যান্সডাউন? Whom I am speaking with?—Doctor Mitter? ভালো আছেন? (শকুন্তলা হাসলো) কে বলুন্ তো? নিশ্চয় ভুলে গেছেন। কোত্থেকে কথা বলছি? রয়াল হোটেল থেকে। এখনো চিনতে পারলেন না? কাল সিনেমায় যাবেন? 'অববধারিত' দেখতে? সে কি, টিকিট কেটে ফেলেছেন? কেন? পাসেই যাওয়া যেতো একসঙ্গে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! চিনেছেন তাহ'লে? আমি শকুন্তলা সরকার। (একটু হেসে) কিন্তু উপস্থিত সোম। (অপূর্বর দিকে তাকিয়ে, হেসে) এখন কাজ আছে? আসুন না তাহ'লে।

বহুদূর থেকে প্রেতের গলার স্বরের মতো উৎপলের কণ্ঠ ভেসে এলো: যাচ্ছি!

ফোন্ ছেড়ে দিয়ে শকুন্তলা অপূর্বর পাশে এসে ব'সলো। ব'ললো: চুল-যে চোখে-মুখে পড়ছে, একটু আঁচড়ে নাও!

—অসভ্যের মতো দেখাচ্ছে, না? অপূর্ব হাসলো।

শকুন্তলা ব'ললো, তা বলছিনে। তবে একটু ভদ্র হ'তে বলছি।

—তা'হলে অভদ্রের মতো দেখাচ্ছে। অপূর্ব উঠে আয়নার কাছে গেলো।

শকুন্তলা খবরের কাগজখানা পুরোপুরি খুলে ফেলে চিত্রগৃহের বিজ্ঞাপনে চোখ দিলো। কুমারী কৃষ্ণা চমৎকার দেখতে কিন্তু। সেই শকুন্তলার বইয়ের নায়িকার ভূমিকায় নামছে। অনসূয়ার চরিত্রকে সেই রূপায়িত করবে। কৃষ্ণাই তো আধুনিক চিত্র-জগতের সেরা

নটী। তার নাম দিকে দিকে রাষ্ট্র। মাত্র বছর দেড় হ'লো সে প্রয়োগ-শিল্পী দ্বারা আবিষ্কৃত হ'য়েছে। নেমেছে মাত্র তিনখানা বইতে, কিন্তু ইতিমধ্যেই যে-খ্যাতি সে বিস্তার করেছে দিকে দিকে, আশা করা যায়, অচির ভবিষ্যতে সে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে।

শকুন্তলা কাগজ থেকে চোখ তুলে বাইরে তাকিয়েই উঠে দাঁড়ালো, এবং বিনয়ে গ'লে যেতে যেতে, ভদ্রতায় ভেঙে পড়তে পড়তে ব'ললো, আসুন।

উৎপল ঘরে ঢুকে পড়লো। অপূর্ব অপরিচিত ভদ্রলোকটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে করতে কাছে এলো এবং ব'ললো, বসুন!

উৎপল ব'সলো এবং অপূর্বর মুখের দিকে তাক'লো। ইনিই বুঝি অন্ধ্র-প্রবাসী প্রফেসার সোম! যা হোক, ভদ্রলোকটির চোখ-মুখের ভাব দেখে তো মন্দ মনে হ'চ্ছেনা।

শকুন্তলা ব'ললো, দার্জিলিঙ তাহলে ছাড়লেন?

সঙ্কোচে আড়ষ্ট হ'য়ে উৎপল ব'ললো, কী আর করি, বলুন! ভাগ্যের ওপর নির্ভর ক'রেই তো বেঁচে আছি, যে দিকে যখন টানবে যেতেই হবে। আপনারা সব ভাল আছেন নিশ্চয়ি। উৎপল ঘরের সিলিঙে, দেয়ালে, মেঝেতে নিমিষের মধ্যে চোখ বুলিয়ে নিলো।

অপূর্ব এতক্ষণে ব'ললো, আপনার নাম শুনেছি, দেখিনি।

উৎপল মনে মনে ব'ললো, Ditto। মুখে ব'ললো, আপনাকে আজ প্রথম দেখলাম, নাম শুনেছি যদিও বহুবার বহু লোকের মুখে। অন্ধ্রতে আপনি কদ্দিন আছেন?

—বছর পাঁচ। অপূর্ব বললো: আপনার ডাক্তারীখ্যাতি আমি মিসেস্ সোমের কাছে বহুবার শুনেছি। সত্যি, দার্জিলিঙ ছাড়লেন কেন? সেখানে পশার প্রতিপত্তি—খান্, সিগরেট খান্। অপূর্ব টিন এগিয়ে দিলো।

উৎপল পকেট থেকে প্যাকেট বার ক'রে ব'ললো, এই যে, সঙ্গেই আছে।

শকুন্তলা ব'ললো, কাল ম্যাটিনিতেই যাচ্ছেন নাকি?

উৎপল ব'ললো, না, সন্ধ্যের সময় যাবো! তখনকারই টিকিট কেটেছি।

—অত তাড়াতাড়ি কেটে ব'সলেন-যে বড়ো! শকুন্তলা সস্নেহ শ্লেষ দিলো।

উৎপল হাসলো, ব'ললো, আপনার বই সিনেমা কোম্পানী নিয়েছে জেনেই, মনে মনে সঙ্কল্প ছিলো প্রথম দিনই দেখবো। সত্যি অবধারিত বইখানার ওপর সব্বার নজর। কেন, তার পরেও তো আপনার তিন চারখানা বই বেরিয়ে গেলো, সেগুলো না নিয়ে নিলো প্রথমটাই।

শকুন্তলা হাসলো, ব'ললো, কি ক'রে বলি বলুন। তাদের কি অভিপ্রায়! (অপূর্বকে) আচ্ছা, কাবেরীর ঠিকানা কি ক'রে পাই বলো তো? বেচারীকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। কবিতা যা লেখে, গ্র্যাণ্ড! তরলিকা আর ও দু-জনেই যদি হাল না ছেড়ে দিতো, তা হ'লে দেখতে—

উৎপল ব'ললো, কাবেরী কে?

—আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'য়েছিলো একদিন কার্সিয়াঙে। তারা

দুই বোন, করতোয়া আর কাবেরী। করতোয়াকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি কোনোদিন। চারদিকে গুজব, সে নাকি দেশছাড়া হ'য়েছে, তবে কাবেরীকে—

শকুন্তলার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে উৎপল ব'ললো, কাবেরী? তাঁকে তো আমি চিনি। তিনি আবার কবিতা লেখেন, জানিনে তো। হ্যাঁ, তাঁর বোন করতোয়া সম্বন্ধে একটু স্ক্যাণ্ডাল আছে বটে।

শকুন্তলা উৎপলের দিকে তাকালো: আপনি চিন্‌লেন কি ক'রে?

—তার ননদ যে আমার বৌ! উৎপল চীৎকার ক'রে হেসে উঠলো: আর বলেন কেন? তাঁর স্বামী এইখানে লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কএ কাজ করছেন, তিনি আমার ছোট সম্বন্ধী। উৎপল আর একবার হাসলো।

—ও হরি! তাই নাকি? শকুন্তলা উৎপলের মুখের দিকে তাকালো: ঠিকানা জানেন?

—ঠিকানা? নম্বরটা ঠিক মনে নেই, তবে বাড়িটা চিনি। উৎপল ব'ললো, এই তো স্কট্ লেন্‌এ, বঙ্গবাসী কলেজটা আছে না? তারি ঠিক বাঁ দিকের গলিটায়।

—সবি চিনলাম। শকুন্তলা হাসলো: আপনি কি ভেবেছেন, আমি কলকাতার গলি-ঘুঁজি সব চিনি! (অপূর্বর দিকে তাকিয়ে) কি, তুমি চিন্‌লে নাকি?

অপূর্ব ব'ললো, কি, ব্যাপার কি?

—বঙ্গবাসী কলেজ?

—তা আর চিনিনে? ওই কলেজ থেকেই পাশ করলাম

ইন্টারমিডিয়েট। গেট্ দিয়ে. ঢুকেই তো সম্মুখে কেমিক্যাল ল্যাবরেটারি। বাঁ দিকের ঘরের পাশেই সরু সিঁড়ি—

শকুন্তলা হেসে উঠলো, উৎপলও না হেসে পারলো না! শকুন্তলা ব'ললো, অত কথা কে জিজ্ঞেস ক'রেছে?

—তবে? অপূর্ব মাথা তুলে ব'ললো, তবে জিজ্ঞেস করছো কি?

—না কিছু নয়। শকুন্তলা উৎপলের দিকে ঘুরে ব'ললো: আপনি কিছু মনে করবেন না তো, যাবার সময় কাবেরীকে একটু সংবাদ দিযে যাবেন। ও গলিতে মোটর ঢোকে তো? তাহ'লে আপনার আর অসুবিধে কি?

—আচ্ছা তাহ'লে উঠি! উৎপল সোজা হ'য়ে বসে চেয়ারের দুই হাতলে দুই হাতের ভর দিলো।

শকুন্তলা ব'ললো, সে কী? আচ্ছা মানুষ তো আপনি! (অপূর্বকে) তুমিও তো বেশ! চা-ফা কিছু এলোনা এখনো?

উৎপল ব'ললো, না, না! চা ফা! কিন্তু আমি, বুঝলেন, এখন এই অসময়, আপনার মাথা খারাপ, আমি উঠি। কাল আসবো আবার বিকেলে। উৎপল উঠে দাঁড়ালো।

অপূর্ব ব'ললো, বসুন। এতো তাড়াতাড়ি কি আছে? একটু চা না-হয় খেয়েই গেলেন!

—মাপ্ করবেন! উৎপল প্রায় হাত জোড় ক'রলো: কালকে বিকেলে আবার তো আসচি!

—বিকেলে? শকুন্তলা ব'ললো: বিকেলে কেন? দুপুরবেলা চ'লে আসুন! ম্যাটিনিতেই সব একসঙ্গে যাবো। হোক্ গে আপনার টিকিট নষ্ট! আসার সময় কাবেরীকে সঙ্গে আন্‌বেন অতি অবশ্য,

আর তার বরটিকেও। ধ'রে-বেঁধে আনা চাই-ই চাই। আপনিও সপরিবারে। ভুলবেন না তো? আমার বই ব'লে না-হোক, কুমারী কৃষ্ণার অভিনয় দেখারো তো একটা লোভ আছে সকলেরি। কাবেরীকে আমার কথা ব'লবেন, অ্যাঁ?

উৎপল ব'ললো, নিশ্চয়, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি ওদের ওখানে।

হ্যারিসান্‌-রোড্‌ ক্রস্‌ ক'রে উৎপলের বাচ্চা-মোটর গাড়ী সোজা আমাহার্স্ট ধরে বোবাজারের দিকে গেলো। শকুন্তলা ওপরের জান্‌লা দিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো।

শকুন্তলা ব'ললো, লোকটিকে কেমন মনে হ'লো।

—মনে হ'লো উনি ডাক্তারী করেন। অপূর্ব একটু হাসি-হাসি মুখে ব'ললো।

শকুন্তলা ব'ললো, সব কথাতেই তোমার ফাজলামো।

—মিথ্যা কথা বলেছি? অপূর্ব ব'ললো: স্ব-চক্ষে তাঁর কোটের ইন্‌-সাইড্‌ পকেটে স্টেথেস্‌কোপ দেখলাম!

শকুন্তলা চুপ ক'রে গেলো।

সরু গলির মুখে মোটর দাঁড় করিয়ে উৎপল মোটরে ব'সে ব'সেই রাস্তায় পা দিয়ে আলগোছে বেরিয়ে এলো, এবং সশব্দে তার পেছনে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে বাঁধানো গলিতে জুতোর নিদারুণ শব্দ ক'রতে ক'রতে নিতান্ত সাহেবী মেজাজে এগিয়ে গেলো। দুর্জয় এখন অফিসে বেরিয়ে গেছে নির্ঘাৎ। তবু কাবেরীর কাছে সে গিয়ে উপস্থিত হোক্‌। আর এই দারুণ সুসংবাদটি তাকে গিয়ে জানাক্‌। স্বয়ং সাহিত্যিক

শকুন্তলা আজ তাকে তলব ক'রেছে। একসঙ্গে যাবে তারা সিনেমা দেখতে। এই উৎপলের সম্মুখে, হ্যাঁ, সম্মুখে বলা চলে বই-কি, শকুন্তলা এই উপন্যাসটি লিখেছিলো কর্সিয়াঙের কাঠের বাড়িতে ব'সে। একেবারে উৎপলের চোখের সামনে ব'সেই বলা চলে।

দরজার কড়া নাড়তেই মৃগাঙ্কবাবু বেরিয়ে এলেন : কে? ওঃ, উৎপল? এসো এসো, হঠাৎ কি মনে ক'রে? লতা ভালো আছে? তোমরা ভালো আছো? তোমার বাবার ব্লাড্ প্রেশার?

উৎপল সব উত্তরই দিলো এবং অন্দরে চ'লে এসে ব'ললো, দুর্জয়বাবু অফিসে গেছেন তো?

কাবেরী ব'ললো, হ্যাঁ। অনেকক্ষণ।

—হ্যাঁ, কি বলে গিয়ে! উৎপল ভুরু টেনে আরম্ভ করলো : শকুন্তলা সরকারকে চেনেন তো?

কাবেরী ব'ললো, কে, শকুন্তলাদি?

—হ্যাঁ, তাই!

—তিনি কি? অনর্থক ভয়চকিত দৃষ্টিতে তাকালো কাবেরী।

উৎপল ব'ললো, তিনি এখানে এসেছেন। এই, রয়াল হোটেলে আছেন।

—তা-ও রক্ষে! কাবেরী ব'ললো : আমি আবার ভাবলাম—

—অন্যায় নয়, মেয়ে মানুষদের নিরর্থক আতঙ্কটা ফ্যাসান। তাঁর বই সিনেমায় দেখানো হবে জানেন নিশ্চয়ি। উৎপল ব'ললো।

কলতলায় একরাশ এঁটো বাসনের ওপর একপাল কাক উড়ে ব'সতেই কাবেরী দুই হাত উঁচু করে তাড়া ক'রে রান্নাঘর থেকে নেমে পড়লো। ফিরে এসে ব'ললো, সত্যি নাকি? জানিনে তো!

—জানেন না? সেকি? এ তো সহরময় রাষ্ট্র! উৎপল বিস্মিত দু'টো চোখ মেলে ধ'রলো।

—আর জানা জানি। কাবেরী অকারণ দীর্ঘ নিশ্বাসের শেষে ব'ললো: সাংসারই আমার বায়স্কোপ, এই দেখতে দেখতে আমার সময় যায়, আর কোনো দিকে তাকানোর সময় কোথায়? ওই দেখুন—এই জাপান, ফের তুমি নোঙরা করছো? না, আর পারা গেলো না!

উৎপল ব'ললো, চীনা কোথায়?

—ঘুমিয়ে আছে। এইমাত্র ঘুম পাড়ালাম। যা দুরন্ত হ'য়েছে সব। আর পারি নে। কাবেরী পুত্র-কন্যার ব্যাজস্তুতি করলো।

উৎপল ব'ললো, শুনুন, যা ব'লতে এসেছি। আসচে কাল, মনে রাখবেন, দুপুর বেলা, ভুলবেন না যেন, আমি অবশ্য এসে হাজির হবো। শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে আমাদের সকলের যেতে হবে বায়স্কোপে।

—দেখি, উনি যদি মত দেন! কাবেরী বিষণ্ণ মুখে ব'ললো।

উৎপল হাসলো: উনি-র মত নেবো আমি, তাঁকেও যেতে হবে। তাঁকে আমার হ'য়ে ব'লে দেবেন, যেন কালকে অফিসে না যান। আমি আসবো বারোটা নাগাদ, অবশ্য লতাকে নিয়ে। শকুন্তলার বই, ব'লেছে: পাস-এ যেতে হবে সকলকে। কুমারী কৃষ্ণা নামছে নায়িকার ভূমিকায়, ভদ্র ঘরের মেয়ে ও।

—হ্যাঁ, ভদ্রঘরের মেয়েদের আর কাজ নেই। কাবেরী নাক সিঁটকালো।

—ফ্যাক্ট্! উৎপল জোর দিয়ে ব'ললো: সব্বাই জানে তা।

কাবেরী ব'ললো, জাপান, পা-জামা নোঙরা হ'চ্ছে। ধূলোর মধ্যে ব'সো না। ওঠো। (উৎপলকে) রেখে দিন আপনি। আমি স্ব-চক্ষে দেখলেও বিশ্বাস ক'রবো না ভদ্রঘরের্ ব'লে।

—বিশ্বাস না করলে উপায় নেই। উৎপল হতাশ গলায় ব'ললো : কিন্তু আপনারা যাবেন। •

—প্রভুর মর্জি! তিনি যদি রাজি হন্, যাবো। কাবেরী ·জাপানের দিকে তাকিয়ে ব'ললো।

উৎপল ব'ললো : প্রভুকে ব'লবেন তিনি যেন কাল অবশ্য বাসায় থাকেন। একদিন অফিস কামাই করলে কোনো ক্ষতি হবে না তাঁর। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের লেখা বই, আর শ্রেষ্ঠ নটীর অভিনীত। আমরাই-বা শ্রেষ্ঠ দর্শক হবো না কেন? যেতে হবে, যেতে হবে! না হ'লে শকুন্তলা দেবীর কাছে আমি মুখ দেখাতে পারবো না। বার-বার ক'রে তিনি আমাকে ব'লে দিয়েছেন, সকলকে এক সঙ্গে ধ'রে নিয়ে যেতে! তাঁরও তো এ কম আনন্দের কথা নয়, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে নিজের বই দেখায় তৃপ্তি যে অসাধারণ। যেতে হবে, যেতে হবে। আর আমি সাধ্‌তে পারবোনা বাপুঃ। আমি চললাম। ডিস্‌পেন্সারী ফেলে অনেকক্ষণ আড্ডা হ'লো।

কাবেরী ব'ললো, সন্ধ্যের দিকে একবার আসুন না, এখন তো কিছুই খাওয়াতে পারলাম না। অপরাধ নিশ্চয়ই মার্জনা করবেন।

—যদি না করি। উৎপল ঘুরে দাঁড়ালো।

—কি আর করবো তা'হলে বলুন! মার্জনা না করলে, অপরাধ স্বীকারও করবো না। কাবেরী হাসলো। এবং ব'ললো,

সন্ধ্যে-বেলা এসে নিজেই ব'লে যাবেন, সেই ভালো। আর পরিবারটিকেও একদিন আন্‌লে তো পারেন!

হাস্‌তে হাস্‌তে উৎপল বেরিয়ে গেলো, ব'ললো, কাল বেলা ঠিক বারোটা, মনে থাকে যেন।

কাবেরী একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস পাত ক'রে নিজের কাজে গেলো। বিশুর মা-ও আজ আবার আসেনি, সব কাজ আজ কাবেরীকেই করতে হবে একা। বাসন মাজা থেকে বাটনা বাটা, সবই আজ তাকে এক হাতে করতে হচ্ছে।

সমস্ত কাজকর্ম সেরে, দু-টি খেয়ে নিয়ে কাবেরী ঘরে এলো। বেলা সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। চীনা এখনো অকাতরে ঘুমচ্ছে। এবার তাকে একটু দুধ খাওয়াতে হয়। বাক্সর পাশে জড়ানো বাণ্ডিল থেকে খানিকটা ন্যাকড়ার ফালি ছিঁড়ে নিয়ে তেলের বাটির ভেতর ন্যাকড়া একটু ভিজিয়ে তাতে আগুন দিয়ে কাবেরী বাটির কাণা ধ'রে দুধ উষ্ণ করে নিলো। চীনাকে কোলে তুলে নিয়ে ঘুমন্ত মেয়ের মুখের ভেতর ঝিনুক পুরে দিয়ে না গেলা পর্যন্ত ধরে থাকলো। চীনার ঘুম ভাঙতেই চেঁচিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলো।

ঝিনুক দিয়ে বাটি বাজিয়ে, পা দুলিয়ে মেয়েকে শান্ত করার চেষ্টা করলো কাবেরী। কোনো গতিকে দুধটুকু খাইয়ে তাকে পাশে নিয়ে শুলো। নিজের বুক এগিয়ে দিলো চীনার মুখে, জাপানকে বারান্দা থেকে ডাকলো কাছে আসতে, কিন্তু সে নাকি তার ঠাকুরদার কাছে ঘুমাবে। তাই ভালো।

পরম আরামে চীনা কাবেরীর বুক চুষতে লাগলো। বক্ষ-রসের

সঙ্গে সাঙ্গে কাবেরীর কাব্য-রসও শুষে নিয়েছে এরা। এই কাবেরীর জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতায় দাঁড়িয়েছে এখন।

কোথাও স্বামীর, কোথাও ছেলে-মেয়ের জীবনে কোনো ছন্দোপতন ঘটছে কিনা, সে দিকে তার নজর প'ড়ছে পলকহীন।

চীনার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে কাবেরী। চীনার মুখের ডৌল, চোখের টানা রেখা, কপালের অপ্রশস্ততা অনেকটা করতোয়ার মতো হ'য়েছে যেন। এ-টা সে লক্ষ্য ক'রেছে অনেকদিন আগেই, কিন্তু কারো কাছে সে প্রকাশ করতে পারে নি আদৌ। কাবেরীর চোখে তার দিদির মূর্তি আজও জ্বল্‌জ্বল্ ক'রে বেঁচে আছে। দুর্জয় কি করতোয়াকে ভুলে গেছে? কই, একদিনও তো দুর্জয় কাবেরীর সম্মুখে করতোয়ার নাম উচ্চারণ করেনি। হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চয়, সে ভোলেনি। কাবেরী যেমন নিজের বুকের মধ্যে স্মৃতির ক্ষত লুকিয়ে রেখেছে, দুর্জয়ও তেমনি রেখেছে অনিবার্য! দুর্জয়-ই না করতোয়াকে ভালোবেসেছিলো, কিন্তু যে-দিন দুর্জয় করতোয়ার ওপর একাধিপত্য বিস্তার করতে ছুটে এলো, এসে দেখে করতোয়া নেই! কাবেরী জানে, করতোয়া কোথায়;—কিন্তু সে কথা সে প্রকাশ করতে পারেনি, নিজের জীবনের ওপর স্বেচ্ছায় বিভীষিকা কে টেনে আনতে চায়, বলো! কাবেরীকে পেছনে আসতে ব'লে করতোয়া পদ্মায় ডুবে মরতে বেরিয়ে গেলো! কাবেরী আর গেলোনা, তাই আজো রইলো বেঁচে। কিন্তু করতোয়া তো কবে ম'রে গেছে। পদ্মার ঘোলাটে জলের নিচে তার সমাধির বাসর রচিত হ'য়ে রইলো। কিন্তু লোকে তাকে জেনেছে অন্যরূপে।

কিন্তু সে-কথা আর ভেবে লাভ নেই, কাবেরী ঘুমিয়ে পড়লো। বিকালে ঘুম থেকে উঠে সাংসারিক টুকিটাকি কাজকর্ম সেরে কাবেরী চুল বাঁধার জোগাড় করলো। জানলার গরাদে আয়না দাঁড় করিয়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে নিলো, এবং চুল ফাঁপিয়ে দিয়ে মাথার ওপর দিয়ে গামছা ঘুরিয়ে এনে গলার কাছে নির্মম হাতে বেঁধে বিনুনি গাঁথতে আরম্ভ করলো। খোঁপা বেঁধে হাতের বাড়ি দিয়ে দিয়ে খোঁপাটি জুৎসই ক'রে সিঁথায় দিলো শৃঙ্গার-ভূষণ, কপালে পরলো লাল টুকটুকে টিপ।

গলিতে জুতোর শব্দ শুনে গরাদে গাল বাধিয়ে দিয়ে যথাসাধ্য দূরে তাকিয়ে দেখলো দুর্জয় আসচে। দরজার কাছে ব'সে কাবেরী জাপানের মুখ মুছিয়ে দিতে লাগলো গামছা দিয়ে।

দুর্জয় ঘরে এলো। গম্ভীর মুখে গায়ের কোট খুললো, শার্ট খুললো, কাপড় পরলো ঢিল ক'রে। ডাকলো, জাপান, এদিকে এসো।

ওদিকে উৎপল লতাকে ব'ললো, তৈরি হ'য়ে নাও। দুর্জয়-বাবুদের ওখানে চলো একবার।

লতা ব'ললো, হঠাৎ আজ ?

—কেন, বাপের বাড়ি যেতে আবার পঞ্জিকা দেখতে হবে নাকি ? যে-সে দিন গেলেই হ'লো। প'রে নাও, প'রে নাও শিগ্‌গির ! ছ-টা বেজে গেছে। যাবো, তারপর সাড়ে সাতটার মধ্যে যেমন-ক'রেই হোক ফিরতে হবে। হ্যাঁ, কাজ আছে। উৎপল তাগাদা দিতে আরম্ভ করলো।

লতার বাঁ-চোখটা আর ভাল হ'লো না। চোখে চষমা দিয়ে, কাগজের মতো খস্‌খসে একটা জংলা-শাড়ি প'রে লতা তৈরি হ'য়ে নিলো।

উৎপল ব'ললো, আমিও কাপড় প'রেই যাই, কি বলো? এই তো বেশ দেখাচ্ছে।

—তাই চলো।

দুর্জয়ের এখানে এসে দেখে, লোক বেশি না হ'লেও যেন রীতিমতো ভিড় বেধে গেছে। সে কি? শকুন্তলা আর অপূর্ববাবু এসে গেছেন দেখছি।

লতার হাত ধ'রে সিঁড়িটুকু তুলে নিয়ে উৎপল ঘরে ঢুকলো: আপনারা এসে গেছেন? বাড়ি ঠিক পেলেন কি ক'রে?

অপূর্ব ব'ললো, বড়ই আশ্চর্য, না? গলিটা তো বলেই এসে-ছিলেন, তারপর খুঁজে নিলাম।

দুর্জয় ব'ললো, এই যে, বসুন উৎপলবাবু। লতা, আয় এদিকে আয়। কাবেরী ভেতরে আছে, তুই বোস্। সে আসচে।

লতা ধীরে ধীরে ব'সলো।

শকুন্তলা লতার দিকে তাকালো। যেমন সে শুনেছিলো, এ তেমন রুগ্ন ব'লে মনে হ'চ্ছেনা। তবে স্বাভাবিকতা থেকে এক-আধ ডিগ্রী নিচু ব'লে ঠেকছে। চোখের চাউনিটা যেন একটু পাগলা-পাগলা গোছের।

উৎপল ব'ললো, আলাপ করিয়ে দি। ইনি আমার স্ত্রী, আর ইনি শ্রীমতী শকুন্তলা। (লতাকে) সেই 'অবধারিত', 'পদ্ম-দীঘির ইতিকথা', 'নানা ভাষা', 'মাদ্রাজী-প্রেম' সব এঁরই লেখা।

লতা হাত তুলে নমস্কার করলো, শকুন্তলাও।

—আর উনি, উনি শকুন্তলা দেবীর স্বামী অপূর্ববাবু, প্রফেসার।

লতা অপূর্বকে অভিবাদন জানালো, অপূর্ব তৎক্ষণাৎ ফেরৎ দিয়ে দিলো, ব'ললো, চমৎকার আনন্দের দিন আজ। সবাই দিকে দিকে ছিলাম বিচ্ছিন্ন, আজ এক জায়গায় মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছি। মেরুতে মরুতে আজ একাকার।

সকলে স্মিত হাসলো।

কাবেরী একলা আলাদা প'ড়ে গেছে, ঠিক দিন বুঝেই বিশুর-মাও মেরেছে ডুব। দোকানের কেনা খাবার অপূর্ব খায়না। লুচি, আলুর-দম, সিঙ্গাড়া আর চা তাকে করতে হ'চ্ছে এক হাতে।

দুর্জয় ফাঁক বুঝে দৌড়ে এসে তাকে সামান্য সাহায্য ক'রে আবার ছুটে গিয়ে ওদের দলে ভিড়ে যাচ্ছে। ওরা জিজ্ঞেস করলে ব'লছে, জাপানটা আবার পালিয়েছিলো, ধ'রে নিয়ে এলাম।

শুভ।

দুর্জয় ব'ললো, এখন আর কোনো নতুন বই-টই লিখছেন না, শকুন্তলা দেবী?

—বই? তা লিখতে হ'চ্ছে বই-কি? না লিখে আর উপায় আছে? এক, প্রকাশকের তাড়া, আর ইন্সপিরেশন প্রকাশের তাড়া। দু-টোই সমান নিষ্ঠুর। শারীরিক ব্যাধি বোঝেনা, মানসিক ক্লান্তি মানেনা। শকুন্তলা মাথা নিচু করলো।

উৎপল আন্তরিক গলায় আরম্ভ করলো: আপনার 'অবধারিত' লেখার সময় কী বিরক্তটাই ক'রেছি। দুপুর-বেলা মন ভালো লাগলোনা, সেই দার্জিলিঙ থেকে ছুটে এলাম কার্সিয়াঙ।

অপূর্ব নড়ে চড়ে ব'সলো।

শকুন্তলা আড়-চোখে অপূর্বর দিকে তাকিয়ে ব'ললো, হ্যাঁ, তা মনে পড়ে বই-কি! কই, কাবেরী আসুক।

উৎপল ব'ললো, সে একদিন গেছে। অতীত মুহূর্তগুলি বড়ো নিষ্ঠুর, একবার হাত থেকে পিছলে গেলে আর তো ফিরে আসেই না, ক্রমশ দূরে স'রে যায় আর হ'য়ে ওঠে বেশি রমণীয়. কি বলেন?

—নিশ্চয়। শকুন্তলা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলো।

লতা নড়ে চড়ে ব'সলো।

উৎপল আরো কী-সব ব'লতে যাচ্ছিলো, শকুন্তলা তাড়াতাড়ি আরম্ভ করলো: এই কাবেরীর কথা ধরুন। কবিতার হাত ছিলো অতি চমৎকার। কিন্তু তা অতীত। শকুন্তলা নিজের কথা হঠাৎ সংক্ষিপ্ত ক'রে ফেললো।

অপূর্ব সিগারেট জ্বালিয়ে ব'ললো, আর তরলিকা, বেচারীর প্রতিভা একেবারে মাঠে মারা গেলো। শুনুন্ তার লেখা কয়েকটা লাইন, সতের বছর বয়সে লিখেছে, তার 'চলিত-চম্পক'-বই থেকে বলছি:

বাহিরে যে-রাতি জাগিয়া র'য়েছে একা,—
তারা-বর্তিকা জ্বালিয়া প্রতীক্ষার,
যে-রাতি ঘুমায়নিকো
তার সাথে মিল আমার অভীপ্সার।
আঁধার-ঘোম্‌টা পরি'
বাহিরে জাগিছে মোর চির-সহচরী।
নিদারুণ ভোর চুরি করে তার বাতি,
ফুঁ দিয়ে নেভার আলো,

তরুণ অরুণ-চুম্বনে মোর সাথী
ঘুচায় তাহার কালো।
বক্ষে আমার জ্বলিল কত-যে শিখা
সব কিছু তার কাব্যে রহিল লিখা।

অপূর্ব থামলো, ব'ললো: এমনি-সব নানা-রকম কবিতা সে লিখেছে।

দুর্জয় ব'ললো, আর লেখেন না কেন?

—হুঁ। আরো লিখবে! দু-দিনের খেয়াল, জলের দাগের মতোই ক্ষণস্থায়ী।

উৎপল বললো, কবিতাটা কিন্তু চমৎকার লাগলো। তিনি কোথায়?

অপূর্ব ব'ললো, পৃথিবীতেই আছে।

দুর্জয়ের কানে তখন কাবেরীর পুরানো কবিতাগুলি ঝঙ্কার দিচ্ছে।

গম্ভীর পয়ার ছন্দের মধ্যে সহসা একটু হাল্কা চৌপদী যদি ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে যেমন বেসুরো শোনায়, দুর্জয়ের কাছে তার নিজের জীবন হঠাৎ তেমনি বেসুরে বেজে উঠলো। ভোর বেলা ভৈরবীর বদলে কে-যেন গেয়ে গেলো দারুণ দীপক। কাবেরীকে সহসা সে তার বধূরূপে মনোনীত করেছিলো কেবলমাত্র কাবেরীর কবিতার খাতিরে, করতোয়াকে অকস্মাৎ সে ক'রেছিলো বাতিল, কিন্তু সেই কবিতা এখন কোথায়? উত্তপ্ত বালুকার ওপর সেই শীতল স্বচ্ছতোয়া তার রেখাটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। তার জন্য দায়ী

দুর্জয়ই অবশ্য। একের পরে এক করে সে-ই তো কাবেরীর বুকের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে সাংসারিক বোঝা।

এই তো। কাবেরী রীতিমতো কোমরে কাপড় জড়িয়ে নিয়েছে, ছেলেবেলার কানামাছি খেলার কথা এখন তার মনে হওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু সেটুকুই-বা অবসর কোথায়?

সকলের সম্মুখে একটি একটি ডিশ সাজিয়ে দিয়ে কাবেরী চ'লে গেলো।

অপূর্ব বললো, সে কী? উনি চ'লে গেলেন? আমরা এলাম যাঁর কাছে, তাঁকে ফেলে—

দুর্জয় একবার অন্দরের দিকে তাকিয়ে ব'ললো, আসচে।

উৎপল ব'ললো, আমরা পরে খেলেও তো পারতাম। এতো তাড়াতাড়ি নেই আমাদের। উৎপল নিশ্চয় তার সাড়ে সাতটায় ফিরে যাওয়ার কথা ভুলে গেছে।

অপূর্ব ব'ললো, সে কি হয়? সব এক সঙ্গেই খাবো। এ-তো উদর-পূর্তি নয়, এ যে উদার ফুর্তি। নিজের ভাষার ঝঙ্কারে অপূর্ব নিজেই হেসে উঠলো।

শকুন্তলা স্বামীর মুখের দিকে অপাঙ্গে তাকালো। ব'ললো, ভাষা-জ্ঞান বেড়েছে।

অপূর্ব বললো, হুঁ। বড় ছোঁয়াচে ওই ভাষা-রোগটি। গা ঘেঁসা-ঘেঁসি থাকলে আক্রমণ করবেই।

শকুন্তলা হাসলো, বললো, ঢের হ'য়েছে। (দরজার দিকে তাকিয়ে) কই, কাবেরী কোথায়?

দুর্জয় সলজ্জভাবে ব'ললো, হয়ত কাপড়টা ছেড়ে আসচে।

অপূর্ব ব'ললো, বড় কষ্ট দিলাম আমরা। কেন-যে মিছামিছি হাঙ্গামা আরম্ভ করলেন।

লতা ধীরে ধীরে উঠে ভেতরে গেলো। তার বাবা ভিতরের ঘরে ব'সে জাপানকে লুচি খাওয়াচ্ছিলেন। লতা ব'ললো, বৌ কই?

—ওই তো রান্না ঘরে। তুই এলি কখন? বোস্।

লতা ব'ললো, তোমার যা কথা। ওদিকে সব্বাই ব'সে আছে!

রান্না ঘরে গিয়ে দেখে সেখানেও কাবেরী নাই, বাইরের ঘরে ফিরে এসে দেখে, কাবেরী সেখানে ব'সে।

জলযোগ শেষ হ'য়ে গেলে তারপর সকলে গাত্রোত্থান ক'রলো।

শকুন্তলা কাবেরীর কাছে এসে ব'ললো, তাহ'লে যাচ্ছো ভাই তুমি। ঠিক ছ'টোর মধ্যে হোটেলে গিয়ে পৌছনো চাই। দুর্জয়বাবু, আপনারা যাবেন। লতা দেবী, সঙ্গে যাবেন তো? উহুঁ, ও-সব শুনছিনা, যেতেই হবে।

লতা ব'ললো, দেখি।

অপূর্ব ব'ললো, না, দেখাদেখি নাই। আপনি যাবেন। এখানে যেমন আজ আনন্দ ক'রে গেলাম, এমনি আনন্দ কাল হোটেলেও হবে। কি বলেন? ওঃ, নিশ্চয়। যাবো বই-কি। আপনাদের ওখানেও যাবো একদিন। তবে কালকের দিনটি নির্বিবাদে কাটিয়ে দিন আপনারা।

শকুন্তলা কাবেরীর কাঁধে হাত দিয়ে ব'ললো; কিছু কথাবার্তা হ'লোনা ভাই আজ। আর একদিন একলাটি চুপ ক'রে চ'লে আসবো। কিন্তু এমন হৈ-হাঙ্গামা চ'লবেনা কিন্তু। আর হোটেলও তো আমার দূর নয় এখান থেকে, একদিন দুপুরে চ'লে গেলেই পারো। বাবার

সময় তোমার কবিতার খাতাটি কিন্তু সঙ্গে নেবে ভাই। কিন্তু কাল বেলা ছ'টো, মনে থাকে যেন। উৎপলবাবু, বার-বার সাধতে পারবোনা কিন্তু, যাবেন।

উৎপল ব'ললো, সাধতে ব'লছে কে? আপনিই তো গায়ে প'ড়ে সাধছেন।

শকুন্তলা আর অপূর্ব রাস্তায় নেমে গেলো। তাদের বিদায় দিয়ে কাবেরী ঘরে এসে দুর্জয়ের সামনে এসে দাঁড়ালো, লতা আর উৎপল যাবো-যাবো করতে করতেও একটু ব'সলো।

মৃগাঙ্কবাবু এসে ব'ললেন, উৎপল, লতা আজ থাক্ এখানে। কাল সিনেমা টিনেমা দেখে তারপর নিয়ে যেয়ো, কেমন?

উৎপল হাস্‌লো, ব'ললো, তবে আমি আসি!

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উঠে এলো জুতোর শব্দ। অর্ধেন্দুই আসছে তাহ'লে। কৃষ্ণা লম্বা ডিম্বাকৃতি আয়নার মধ্যে তার নিজের পরিপূর্ণ ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রইলো। ছায়া-ছবিতে সে যতটা রূপসী বাস্তবিক ভাবে দেখতে-গেলে রূপসী সে আরো। সে খবর তার নিজের অজ্ঞাত নয়।

আর্শির ভেতরে অর্ধেন্দুর ছায়া দেখে কৃষ্ণা ফিরে তাকালো, ব'ললো, Come in ! ব'সো ।.

—এখনো ব'সবো ? হাতের ঘড়ি কৃষ্ণার সামে মেলে দিয়ে ব'ললো, আড়াইটে ।

—বাজুক্ ! কৃষ্ণা তার দেহের প্রতিটি রেখায় সূক্ষ্ম কম্পন জাগিয়ে ব'ললো : তাই ব'লে সঙ্ সেজে যেতে তো পারবোনা। না-হয় দু-এক মিনিট দেরীই হবে। কার্ আনোনি ?

—নিশ্চয় ! অর্ধেন্দু সোফার মধ্যে ব'সতে ব'সতে ব'ললো ।

—তবে আবার কি ? কতক্ষণ আর লাগবে এখান থেকে যেতে ? বড়ো জোর বিশ মিনিট ! তিনটেয় তো আরম্ভ, তবু দশ মিনিট সময় পাবো হাতে। সিল্কের নীল এক টুক্‌রো ফালি আঙুলে জড়িয়ে কৃষ্ণা আর্শির কাছে গিয়ে চোখের কোণ পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলো ।

অর্ধেন্দু ব'ললো, তোমার অ্যাকশান্-গুলোই দেখবার ।

কৃষ্ণা মুখ ঘুরিয়ে সকৌতুকে ব'ললো, আর তোমার গুলো শোনবার ।

—বিশ্বাস করছো না ? সত্যি বলছি, তোমার টার্নিংগুলো নেওয়া, তোমার মাথা-ঝাঁকি দিয়ে কথা বলা কিংবা চুপ ক'রে মিটি মিটি হাসা—সবগুলোর মধ্যেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিখুঁৎ আর্ট আছে। অর্ধেন্দু স্তুতি গাইলো ।

কৃষ্ণা কৃত্রিম-গর্বে বুক বিস্ফারিত ক'রে ব'ললো, না-হ'লে কি আর Garbo of the East হ'য়েছি মিথ্যাই ! মিথ্যাই কি লোকে বাহবা দিচ্ছে ?

অর্ধেন্দু ব'ললো, তা সত্যি। কিন্তু কৃষ্ণা, তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি আজো রাখলে না। আজো তুমি তোমার জীবনের ইতিহাস আমাকে ব'ললেনা। রীতিমোতা ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বলার মতো অর্ধেন্দু বলে গেলো।

এতে কৃষ্ণার গায়ে আঁচড় লাগার কিছু নেই। অর্ধেন্দুর এ-রকম কথায় সে অভ্যস্ত। অনেকদিন ধ'রেই তো এই অর্ধেন্দুর সঙ্গে তার পালা গাইতে হচ্ছে। যে ক'টা বই-তে কৃষ্ণা নেমেছে নায়িকারূপে, অর্ধেন্দু হ'য়েছে তারি নায়ক। কত রকম ভালোবাসার কথা, কত ঘৃণার কথা, কত-রকম অশ্লীল ইঙ্গিত অভিনয়ের মধ্যে তাকে শুনতে হয়েছে, শুনে শুনে বাস্তব সংসারেরও কোনো ইসারা তাকে কাবু করতে পারছেনা, আয়ত্ত ক'রেছে সে এমনি দৃঢ়তা।

তারা দু'জন মোটরে ঢুকলো। স্টার্ট দিয়ে অর্ধেন্দু বললো, 'অবধাবিত'-বইএর মেকি অ্যাক্সিডেণ্ট না ক'রে আজ যদি সত্যিই অ্যাক্সিডেণ্ট করে বসি।

—মরবো। অনায়াসে বললো কৃষ্ণা।

ভিড়েব রাস্তা দিয়ে চালাতে চালাতে অর্ধেন্দু ব'ললো, প্রথম দিন নিজেদেব অভিনয় একবারে দেখতে ইচ্ছে করে, না? নইলে কত-বার তো দেখেছি স্টুডিয়োতে।

—বই দেখতে তো ঠিক ইচ্ছে করেনা। কোন্ অভিনয়ে বেশি বাহবা পাওয়া যায় দেখতে ইচ্ছে করে সেইটুকু। কৃষ্ণা ব'ললো।

অর্ধেন্দু ব'ললো, এখন এক কাজ করলে হয় না? একটু বোটানিক গার্ডেন্ থেকে বেড়িয়ে এলে?

—খুবই অন্যায় হয়। কৃষ্ণা গম্ভীর মুখে ব'ললো।

অর্ধেন্দু চকিত কটাক্ষে কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকালো, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে ব'ললো: তোমার জীবনের কাহিনীটুকু শোনবার আমার ভয়ানক ইচ্ছে। তুমি আলাপ আলোচনা করো, ভালোবাসার ভাণ করো, এতো অভিনয় করো, তবু একটু ভালো-বাসতে পারোনা? কেন, আমি কি ভালোবাসা পাবার যোগ্য নই?

—কি ক'রে যোগ্য বলি, বলো? তুমি সত্যি আমায় ভালোবাস? যদি বলো হ্যাঁ, জেনে নেবো স্বার্থের খাতিরে মিথ্যা ব'লছো। কৃষ্ণা অবিকৃত মুখে ব'লে গেলো।

—আমার স্বার্থ? স্বার্থ আমার এমন কী থাকতে পারে, কৃষ্ণা?

—স্বার্থ কি, তা-ও ব'লে দিতে হবে? প্রত্যেক পুরুষের যে স্বার্থ প্রত্যেক মেয়েকে নিয়ে। আমাকে আর বিরক্ত ক'রোনা ও-কথা নিয়ে। মনে রেখো, আমি ডরোথি নই, চন্দ্রা নই, গঙ্গাবাঈ নই, আমি কুমারী কৃষ্ণা। দেখো, আর একটু হ'লেই চাপা দিয়েছিলে আর-কি।

অর্ধেন্দু ব'ললো, তবে এ-পথে এসেছো কেন?

—এ-পথ কী পথ নয়? অর্থোপার্জন চাই, পরম সুখে বেঁচে থাকতে চাই, তাই এসেছি। তোমরা যদি বেশি জ্বালাতন করো ছেড়ে দিতে বাধ্য হবো। কৃষ্ণা ব'ললো।

—অর্থোপার্জনের কি আর পথ নেই?

—আছে, কিন্তু এইটেই আমার পরম প্রশস্ত পথ। অভিনয় জানি, অভিনয় বেচি, আর কিছু নয়। কৃষ্ণা বাইরে তাকালো।

—ভালো। কিন্তু এ-পথ নিরাপদ নয়, উপদ্রব সহ্য করতে হবে অজস্র, শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা মুস্কিল। অপূর্ব স্টিয়ারিং ডানদিকে ঘুরিয়ে দিলো।

—ভবিষ্যতের কথা ভাবিনে। হয়ত পতন হবে, জানি। কিন্তু যদ্দিন নিজের সঙ্গে যোঝা যায়, ততদিনই পরম পরিতৃপ্তি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অর্ধেন্দু ব'ললো, তা হ'লে কি বলতে চাও, কাউকে ধরা দেবেনা, কাউকে ভালোবাসবে না?

—কেন বাসবো না? ভালোবাসতে না জান্‌লে মানুষ ম'রে যেতো। আমিও একজনকে ভালোবাসি ব'লেই আমি আজ অভিনেত্রী? ভালো-বেসেছিলাম ব'লেই—ওকি, ব্রেক করো। এসে গেছি যে আমরা।

শো আরম্ভ হবো-হবো হয়েছে। প্রথমের ছোট একটা কমিক বই এই মাত্র পর্দায় লাফিয়ে পড়বে। তারা দু'জন রাস্তায় নাম্‌তেই এদিক ওদিক থেকে সকলে শ্যেন-দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালো। ভ্রূক্ষেপ না করে তারা ওপরে চ'লে গেলো। প্রেক্ষাগৃহ গাঢ় অন্ধকার। আলো থেকে অন্ধকারে এসে অন্ধকার গাঢ়তরো মনে হলো। মেঝেতে পা ঘ'সে ঘ'সে ধীরে ধীরে তারা এগিয়ে গেলো। ওদিক থেকে একজন ছুটে এসে টর্চ জ্বালিয়ে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো।

প্রথমের কমিক বইটায় হাসির খোরাক আছে অজস্র। অর্ধেন্দু আর কৃষ্ণার পেছনে একপাল পুরুষ-মেয়ে ভয়ানক হাসছে। তাদের মুখে একটু আলো পড়ায় আবছা দেখা যাচ্ছে বই কি।

কমিক বই শেষ হ'লো বিরাট হাসির মধ্যে দিয়ে।

ধীরে ধীরে স্ক্রীন্‌এর উপর ছায়া পড়লো বিরাট একটি এরোপ্লেনের।

তার ওপরে আলোক-শিল্পী, শব্দ-যন্ত্রী, প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ইত্যাদির নাম থেকে থেকে মিলিয়ে গেলো। অবশেষে নাম এলো লেখিকার, পেছনের সীটএ ব'সে শকুন্তলার বুক স্ফীত হ'লো। বই যখন আরম্ভ হ'লো তখন পর্দার ওপরে দেখা গেলো একটি পাহাড়ী রাস্তা, এঁকে বেঁকে বহুদূর চ'লে গেছে। এই সময় বহুদিন পরে দিলীপের কথা মনে পড়লো শকুন্তলার। ক্যামেরা মুখ ঘুরিয়ে বিরাট একটি অসমতল প্রান্তর দেখালো। ভারী চমৎকার লাগছে কাবেরীর, সে দুর্জয়ের হাত চেপে ধ'রলো। সেই কতদিন আগে সে গিয়েছিলো কার্সিয়াঙে, তখন সে এমনি পাহাড় দেখেছে। ক্যামেরা আবার ঘুরলো, দেখালো খাদ। খাদের নিচে ঢালুপথ ধ'রে কয়েকটি পাহাড়ী মেয়ে স্তিমিত সুরে পাহাড়ী গান করতে করতে মিলিয়ে গেলো। উঃ, কাবেরীর যা আনন্দ লাগছে। দুর্জয়কে ধ'রে বেঁধে একবার সে পাহাড়ে বেড়াতে যাবেই যাবে। ক্যামেরাও ধীরে ধীরে রাস্তা দিয়ে নেমে গেলো। একটা ক্রেপটোমারিয়া গাছের গায়ের কাছে এসে ক্যামেরা থেমে গেলো। সেই গাছে হেলান দিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। এই নিশ্চয় নায়িকা, নিশ্চয় এ শকুন্তলার বইয়ের অনসূয়া।

ঠিক, যা ভেবেছে। পেছন থেকে কে যেন ডাকলো : অনসূয়া।

মেয়েটি ফিক্ ক'রে হেসে মুখ ঘুরিয়ে তাকালো। এ কী, কাবেরীর বুকের মধ্যে হঠাৎ খচ্ ক'রে উঠলো কেন? তৎক্ষণাৎ মেয়েটিকে আড়াল দিয়ে দেখালো একটি ছেলেকে, সে-ও দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে।

ধীরে ধীরে মেয়েটির কাছে এসে ছেলেটি ব'ললো, অনসূয়া, আজ আমি যাবো।

—আজই ? অনসূয়া ধীরে ধীরে ব'ললো : কেন, না গে.
হয়না ?

দুর্জয়ের মুঠি দৃঢ় হ'লো, আঁ্যা এ যে, এ যে করতোয়া।

কাবেরীর দেহের ভেতর দিয়ে ইঞ্জিন চলছিলো। সেকি, তার f
বেঁচে আছে ? পদ্মায় ডুবে সে আত্মহত্যা তাহলে করেনি ! কা
আর চুপচাপ থাকতে পারলো না, রীতিমতো চেঁচিয়ে উঠলো : দি
দিদি !

দুর্জয় ব'ললো অস্ফুটে : করতোয়া, হ্যাঁ উৎপলবাবু, এ করতোয়া

সামের সিটে ব'সে কৃষ্ণা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। পেছন ি
তাকালো।

উৎপল ব'ললো, দুর্জয়বাবু, চুপ করুন ! কাবেরী দেবী, থামুন।

প্রেক্ষাগৃহের সকলে তখন চীৎকার আরম্ভ করেছে : ওপরে গোল
মাল হচ্ছে বড়। অর্ডার প্লিজ।

কৃষ্ণা আর চুপ করে থাকতে পারলোনা, অর্ধেন্দুর হাত ছাড়ি
উঠে এলো. ফিকে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ডাকলো, কাবী।